KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৮ সুখিয়ার দত্ত লেন, কল-৮
Collection : KLMLGK	Publisher : তিমির দেব (5/2)/ শ্রীহরি মুখোপাধ্যায় (6)
Title : অনার্য সাহিত্য (ANARJYO SAHITYA)	Size : 8.5"/5.5"
Vol. & Number : 5/2 6 8 9	Year of Publication : Oct - 1986 Jan - 1987 Jan - 1988 Nov - 1988
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : শ্রীহরি মুখোপাধ্যায়	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

অনার্য সাহিত্য

অক্টোবর ১৯৮৬ (শারদ সংকলন)

'৮০ দশকের স্বাধীন লেখকদের মুখপত্র

What have you done with your Science ?

What have you done with your Humanism ?

What is your dignity as a thinking Reed ?

45,000 die of hunger every day

—The Statesman, January, 1985

২য় কভার ফুল পেজের বিজ্ঞাপনের দাম ১০,০০০ টাকা না আরো বেশী? এই বিজ্ঞাপনটি 'পৃথিবীর তৃতীয় শক্তি'-র অসংখ্য বুভুক্ষু মানুষের কাছ থেকে ১ পয়সার বিনিময়ে আমরা সংগ্রহ করেছি।

প্রতিষ্ঠান বিরোধীতা

[অনার্য সাহিত্যের ২য় সংখ্যায় **মলয় রায়চৌধুরীর** হাংরি আন্দোলন চলার সময় লেখা কবিতা 'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার' পুনর্মুদ্রণ করায় বহু সাধুচরিত্রের মানুষ আমাদের ওপর ভয়ংকর ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। পোষাকী বিপ্লবীরা অভিমান করেছিলেন।

এবার **মলয় রায়চৌধুরীর** একটি তীব্র ক্ষারযুক্ত গদ্য ছাপা হোল। এখন তিনি বাংলার বাইরে থাকেন, এখানে-ওখানে লেখা ছাড়া কোন যোগাযোগ নেই। কিন্তু বাঙলা সাহিত্যের মুদি ও গয়লাদের মত তিনি চেনেন ছিঁচকে বিপ্লবীদেরও। এই লেখায় উলঙ্গভাবে তিনি তাদের আক্রমণ করেছেন। ভণ্ডামি কত সুক্ষতায় পৌছে গেছে এবং আমরা কত সহজভাবে এখনও সব কিছুকে বিচার করি তা তিনি দেখিয়েছেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য এই লেখাটির সঙ্গে তিনি কোন চিঠি বা একটি শব্দের কোন নোট পাঠাননি।

হাংরি অন্দোলনের অন্যতম প্রধান চরিত্র, যাটের প্রধানতম বিতর্কিত কবি মলয় রায়চৌধুরীর এই লেখাটি তার গভীর হতাশা না আবার ফিরে আসার তীব্র ইচ্ছা থেকে লেখা তা বিচার করতে হলে এই লেখা মনোযোগ ও নিরপেক্ষতা দাবী করে। পাঠক, আপনি···]

কলকাতায় প্রতিষ্ঠানবিরোধী বলতে এখন যা বোঝায় সে সব দেখে আমি নিজেকে প্রতিষ্ঠানবিরোধী লেখক বলে মনে করিনা। আরও এইজন্যে করিনা যে, আমি ওই লেখক কবিদের সঙ্গে নিজেকে আইডেনটিফাই করতে চাইনা। কলকাতায় এসট্যাবলিশমেণ্ট বলতে বোঝায় দেশ-আনন্দবাজার ব্যাস। মানে, আপনি দেশ আনন্দবাজারে লেখেন না, আপনি প্রতিষ্ঠান বিরোধী। আপনি দিব্বি পরিচয়-প্রতিক্ষণ বা যুগান্তর-আজকাল-সত্যযুগ-বসুমতি-গণশক্তি-কালান্তরে লিখতে পারেন, আপনার চোদ্দো খুন মাফ। দেশের সুনীলবাবুকে আপনি খিস্তি করুন, আপনি হয়ে গেলেন প্রতিষ্ঠানবিরোধী। সেই একই চ্যারিটি শো ফেরত শঙ্খ ঘোষের কড়ে আঙুল ধরে আপনি নানান কাগজ দফতরে যান, বইয়ের রিভিউ করান, আপনার আঠাশ খুন মাফ। আপনি যদি মোহনবাগানের দলে না হন তো, আপনি ইষ্টবেঙ্গলের। আপনি

চিংড়ি বা ইলিশ বা মুগির দলে। আপনি কুচো মাছের দলে যাবেন না কেননা আপনার প্রতিষ্ঠানবিরোধিতার জন্যে দাদা চাই স্পনসর চাই। আপনার চাই চিমা। আপনি খেলার মাঠের লিটল দলের ধার ধারেননা কারণ আপনি তো কবি-লেখক, আপনিতো চাকরি করেও বুদ্ধিজীবি। জীবনের অন্য লিটলগুলোর আপনি ধার ধারেন না। আপনি শুধু চেনেন লিটল ম্যাগ। আপনার অসুখ করলে আপনি মালটিন্যাশনালের ওষুধ খাবেন, আপনি স্নানতেও চাইবেন না কোনও লিটল কোম্পানির ওষুধ আছে কী না।

আপনার দাঁত মাজা দাড়ি কাটা কাপড় কাচা সব একচেটিয়া কোম্পানির জিনিষ. ছোট কোম্পানির খোঁজই রাখেন না আপনি কারণ আপনার সময় কোথায়। আপনাকে তো পদ্যগদ্য নিয়ে ভাবতে হয়। ভাবতে ভাবতে আপনি দারিদ্রের আইডিয়ালাইজ করবেন। আপনার হিরো নায়ক দারিদ্রের বিরুদ্ধে লড়ে না, স্থিতাবস্থা বজায় রাখার বিরুদ্ধে লড়ে না, চলতি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়ে না। সে লড়ে জোতদারের সঙ্গে। সে লড়ে পরসাঅলার সঙ্গে। কেননা ওটাই নাকি শ্রেনীলড়াই। আপনার কাছে যা শ্রেণী লড়াই তাই-ই প্রতিষ্ঠ নবিরোধীতা। আপনার কাছে পশ্চিমবাংলাটাই ভারত যেমন আপনার কাছে এককালে তেলেঙ্গানা মানে ছিল অন্ধ্র আর নকশালবাড়ি মানে ছিল পশ্চিমবঙ্গ। অন্য প্রদেশের সাহিত্যে কী হচ্ছে তাতে আপনার তেমন আগ্রহ নেই। আপনার আগ্রহ লাতিন আমেরিকায়। আপনি অন্যদের পিগমি বলে হিউমিলিয়েট করে নিজেকে বড়ো ঠাওরাবেন। আপনার কাছে আপনার গোষ্ঠীর লোকরাই কেবল প্রতিষ্ঠানবিরোধী এবং তার বাইরের লোকেদের লেখা আপনি ছাপাবেন না কারণ আপনার ছাঁকনি প্রয়োগ করে আপনি সব টের পান। আপনি আদালত, পুলিশ, নেতা, ইউনিয়ন, ধর্মগোষ্ঠী, পাড়ার পুজো, রাজনৈতিক দলকে স্পেসিফিক আক্রমণ করবেন না। আপনি কেবল ভাসা ভাসা লিখবেন, ইঙ্গিতে আকারে বোঝাবেন। আপনি শহর কেন্দ্রিক মজুরদরদী। কৃষক বা কৃষিকাজ সম্পর্কে জানার দরকার মনে করেন না। আপনি কার জন্যে লিখছেন আপনি কোন ভাষায় লিখছেন ভাবার দরকার মনে করেন না। গদ্য বলতেই আপনি কেতাবি বুকনি ঝাঁড়বেন শক্ত শব্দের বাতেলা দিয়ে। পদ্য হলে আপনি অলংকার আর ছন্দ খুঁজবেন। আপনার কাছে এসট্যাবলিশমেণ্ট মানে লেখক অথচ এই

লেখকগুলোকে যে অসিত বাঁড়ুজ্যেরা টিকিয়ে রেখেছে তারা আপনার নজর এড়িয়ে যায়।

বাজারের লেখক পুরস্কার পেলে আপনি চটে যান। কই আপনি তো কখনও পুরস্কার কমিটির স্কাউণ্ড্রেলগুলোকে ধরে ধরে এক্সপোজ করলেন না। আপনিতো কাঁটাছেঁড়া করে দেখালেন না পাভলভের কোন কুকুরগুলোতে ওই পুরস্কার কমিটিগুলো ঠাশা যে ধারাবাহিক লেখাই বেশি পুরস্কার পায়। প্রতিটি ঘাঁটির পেছনে যে মাফিয়া-চক্র তা নাম ধরে ফাঁস করেন না কেন? তার মানে তো আপনি ভিতু, কাওয়ার্ড। আপনি আবার কী প্রতিষ্ঠান বিরোধীতা করবেন। বরং কফিহাউসে গুলতানি করুন, হসন্ত দিলে আধমাত্রা হয়ে যায় কী না এসব চিন্তা করুন। আপনি তো ভদ্দরলোক। ছোট লোকদের ভাষা ব্যবহার করা চলবে না। সরকার আর ঘোষ পরিবারদের পুঁজিপতি হওয়াটা আপনার খারাপ মনে হয় কিন্তু বাড়ীতে আপনি মোদি সিংহানিয়া আমবানি গোদরেজ মালহোত্রা ওয়াডিয়াদের জিনিস ব্যবহার করবেন। আপনার পত্রিকায় এদেরই জিনিসের বিজ্ঞাপনের জন্যে দৌড়োদৌড়ি করবেন। এমনকি আপনার কাগজে প্রতিষ্ঠান বিরোধীতার অণ্ডয়াজ জোরদার করার জন্যে আপনি নিজের বাবা মা বউ ছেলে মেয়ের ডালভাতকেও তেমন দরকারি মনে করেন না। আপনার দরকার ইমেজ। তাই খাদি খদ্দর পরবেন। অথচ আরও অনেক জিনিষই হাতের কাজের কারিগররা তৈরী করেন। ছোটলোকরা অ্যাদ্দিন গাঁজা আফিম দিশি খাচ্ছিল তখন আপনাদের টনক নড়েনি। যেই ওটা আপনাদের মতন ভদ্দর লোকদের ঘরে ঢুকেছে ওমনি আরম্ভ হয়ে গেছে নাকে কান্না। ভদ্দর লোকেদের সেজেগুজে, নাচানাচিটা আপনাদের সংস্কৃতি। গরীবের ধেনো খেয়ে ল্যাংটো নাচটা আপনার কাছে অপসংস্কৃতি। আপনি আফরিকার নাচ গান পছন্দ করেন না, ওদের হইহুল্লোড় খারাপ লাগে, কেননা অমন সুঠাম শরীর তৈরী করতে পারেনা ভেতো বাঙালীরা। শরীরের স্বাধীনতায় আপনার ভয় করে। আপিসের টেড ইউনিয়ন নেতাটি যাওনার মাইনে নেবেন কিন্তু কোনও কাজ করবেন না কারণ তিনি লেনিনের ঘুওরালি-বাল। আপনি তার বিরুদ্ধে লিখতে সাহস পাবেন না জানি, তার দলবলের তাগড়া প্রতিষ্ঠান আপনাকে আড়ংমশলার ধোলাই দেবে। ধর্মীয় দাঙ্গা-মারামারি নিয়ে লেখালিখিও বিপজ্জনক, তাতেও এক্সপোজ করার দরকার হয়। আপনি

হিন্দু। আপনি হিন্দুদের ত্যাঁদড়ামির বিরুদ্ধে লিখবেন, বা আপনি মুসলমান। আপনি মুসলমানদের ত্যাঁদড়ামির বিরুদ্ধে লিখবেন। অন্য ধর্মের লোকেদের ত্যাঁদড়ামির বিরুদ্ধে লেখা চলবে না। তাহলে আবার সাম্প্রদায়িক লেবেল খেয়ে যাবার রিস্ক আছে।

তাই শিখ তামিল গোর্খা মিজো নাগাদের সম্পর্কে ভাববার সময় নেই। ওগুলো বোধহয় ছোটখাট ব্যাপার। অরওয়ালে যাবার দরকার মনে করেন না। কলকাতায় বসে বক্তিমে ঝড়াই যথেষ্ট। আপনি আগে ভাবতেন ভিয়েতনাম। এখন ভাবেন দক্ষিণ আফরিকা। ভারতবর্ষ নিয়ে মাথাব্যাথা নেই। লিটল ম্যাগাজিনের লোক হয়েও লিটল রাইটার বা লিটল আর্টিস্টদের কথা থাকে না আপনার কাগজে। যে সেতার বা তবলাবাদক বা গাইয়ে লড়ছে দাঁড়াবার জন্যে তাকে আপনার কাগজে দাঁড় করাবেন না। লিটল কবি লেখকদের সম্পর্কে তো আপনি লিখবেন না। ভয় আছে। তারা যদি র‍্যাট রেসে আপনার থেকে এগিয়ে যায়। আপনি তাই ঘুরে ফিরে কিছু দেশী-বিদেশী নাম কপচাবেন যারা প্রতিষ্ঠিত। আপনি বাজারি-বাজারি বলে কিছু লেখক-প্রকাশকের নাম ধরে চেঁচাবেন। কী করে একটা বামপন্থী সরকারের বিজ্ঞাপন খেয়ে আর তার লাইব্রেরিতে বই বেচে এরা দাপটে রাজত্ব করছে সে রহস্য ফাঁস করতে চাইবেন না কেননা আপনিও আবার বামপন্থী। ফলত আপনার চাই দায়বদ্ধতার লেবেল। মানে, অন্য লোকরা আপনাকে দায়বদ্ধ বললেই হয়ে গেল। আপনি নিজে যাই হোননা কেন। এদিকে আপনি হয়তো কোনও আপিসে ঠ্যাঙনাচানো প্যারাসাইট। বা আপনার কাউন্টারে খদ্দেরের লাইন পড়েছে আর আপনি ক্যান্টিনে ক্যারাম খেলছেন বা মুখে বোরোলীন-পাউডার মেখে ইস্কুলে ছেলেদের সেগুলোই আওড়াচ্ছেন। যেগুলো নিজে দশ পাঁচ বছর পড়েছিলেন বা পয়সা থাকলেও বিনা টিকিটে বাসে ট্রামে ট্রেনে চেপে রবীন হুড মনে করছেন নিজেকে। বাজার-মেশিনে আপনিও তার মানে তেল দিয়ে বেড়াচ্ছেন। আপনি যদি আমলা হন তো কথাই নেই। আমলাদের দেখুন। তাদের কাজই সব যেমনকে তেমন বজায় রাখা। শুধু বাকতাল্লা। মিটিং-কাজু-কফি-লিমকা। সেমিনার ওয়ার্কশপ কনসালটেটিভ কমিটি স্ট্যান্ডিং কমিটি ওয়ার্কিং গ্রুপ স্ট্যাডি গ্রুপ কমিশন। লুটের নানান মেশিন। কিন্তু এসব আপনার চোখে পড়ে না। আপনি শুধু লেখকদের নিয়েই মজে আছেন। বাজার থাকলে মিকি স্পিলের হ্যারল্ড রবিন্স ইয়ন ফ্লেমিং হ্যাডলি চেজরা থাকবেই।

কিন্তু তাদের যারা সাহিত্যিকের লেবেল দেয়, তুলে ধরে, সেইসব জোচ্চোরদের কলার চেপে ধরার কথা আপনার মনে পড়ে না। এইসব জোচ্চোররাই আবার বই রিভিউ করে। বিক্রি বাড়াবার জন্যে শুধু নয়, সাহিত্যের ইতিহাসে জবরদস্তি ঠেলে ঢোকাবার চেষ্টাও ওই ফড়েগুলোই করে। রাইটার্সে ওদের লোক থাকে, কলেজে থাকে। পুরস্কার কমিটিতে থাকে। যে লোকটা বলছে রবীন্দ্রনাথ কলকাঠি নেড়ে নোবেল পেয়েছিলেন, দেখবেন হয়তো তার ভাই বেরাদর নাম ভাঁড়িয়ে নানান কমিটিতে থাপটি মেরে বসে এর ঠ্যাঙ টানছে বা ওকে গাছে তুলছে। আচার্য্য সেজে বসে আছে। রবীন্দ্রনাথ এসট্যাবলিশমেন্ট। কিন্তু যারা ওই এসট্যাবলিশমেন্টটাকে চারদিক থেকে কাঁধ দিয়ে খাড়া রেখেছে তাদের আপনি ছেড়ে দিচ্ছেন কেন। তাদের ছেড়ে দিয়ে আপনি পড়ছেন রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে। কেন? এদিকে যে ভাষাটায় লেখালিখি করছেন সেটাতো জোড়া-সাঁকোর ঠাকুরসাহেবের বানানো। নিজের একটা ভাষাকাঠামো বানাবার চেষ্টা করছেন না কেন। তা থেকে বাদ দিন রবীন্দ্রনাথকে। যতোটা জায়গা রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ঘ্যানর-ঘ্যানর করে নষ্ট করছেন সে জায়গায় তো একজন ক্রিয়েটিভ লিটল রাইটার বা লিটল আর্টিস্টকে বরাদ্দ করা যেতো। এখনও অনেক কমরেড রবীন্দ্রনাথের ভাষা বাদ দিয়ে মার্কসবাদ বোঝাতে হিমসিম খান। শ্রেণী সংগ্রাম বা দ্বন্দ্ব এসবের এখনও ওদ্দি মজুরদের বোঝাবার মতন শব্দ পাওয়া গেল না। বস্তিতে ঢুকেও পার্টির বাবুরা রবীন্দ্রনাথ হাতড়াতে থাকেন। গড়ের মাঠে ধুতিকুর্তা পরা কমরেডদের বক্তিমে শুনুন—আগাপাশতলা রবীন্দ্রনাথ। পার্টির খুচরো কর্তারা অথচ নিজেদের নিউজপ্রিন্টে রবীন্দ্রনাথকে ধোলাই দিয়ে বেড়াচ্ছেন।

আপনি যদি কমরেড প্রতিষ্ঠান বিরোধী হন তাহলে বাড়তি হাঙ্গামা। অন্য দেশের কমরেডের বিরুদ্ধে আপনি মুখ খুলতে পারবেন না—যে বাঞ্চোৎরা অস্ত্রশস্ত্র পাঠিয়ে আপনার দেশটাকে বালকানাইজ করার তালে আছে, কারণ আপনি নিজেকে বোঝাচ্ছেন যে ওভাবেই সাম্যবাদ ইমপোর্ট হচ্ছে অথচ তলেতলে জানেন মুখ খুললেই ওসব দেশে বিনে পয়সায় যাবার ভাবনা তো ছেড়েই দিন নিজের পয়সায় যেতে চাইলেও ভিসা পাবেন না। তাছাড়া আপনার কাছে তো কলেজ স্ট্রীট বইপাড়া ছাট ইজ কলকাতা ছাট ইজ পশ্চিমবঙ্গ ছাট ইজ ইণ্ডিয়া। আর ধরুন আপনি হলেন সরকারী কর্মচারী প্লাস কমরেড প্লাস

প্রতিষ্ঠান বিরোধী তাহলে ওক মাইরি দাবীর পর দাবী তুলতে থাকুন। সিঁড়িতে পোস্টার ঘরে পোস্টার মুতখানায় পোস্টার অলিতে পোস্টার গলিতে পোস্টার দিয়ে এটা দাও সেটা দাও ওটা দাও দাও দাও দাও বিপ্লব বিদ্রোহ চালিয়ে যান। জাহান্নামে যাক শালা মজুর কৃষক। আমাকে দাও দাও দাও দাও দাও। যে সরকারী খানকির বাচ্চারা ঘুষ নিচ্ছে তাদের দিকে চোখ বুজে থাকুন কারণ সেই বেজন্মাদের লবি অনেক তাগড়া। আপনি চালিয়ে যান আপনার পদ্যগদ্য-গল্প-কবিতা-উপন্যাস-প্রবন্ধের লেখালিখির প্রতিষ্ঠান বিরোধীতা। ওতে কাউকে ঘাঁটানোও হয় না আর নিজের প্রতিষ্ঠান বিরোধীতার বিজনেসও বজায় থাকে। যে কোনও দোকানদার ব্যবসাদারকে বুর্জোয়া পুঁজিপতি লেবেল দিয়ে দল বেঁধে যারা লাটে উঠিয়ে বাঙালীর জায়গায় মারোয়াড়ি গুজরাতি পানজাবি সিন্ধিদের ঘুরিয়ে টেনে আনছে তাদের লাই দিয়ে মাথায় তুলুন। একদিকে বাঙালীদের ব্যবসাকে গোটাবার ষড়যন্ত্রে যারা অংশীদার তাদের সম্পর্কে কথাটি বলবেন না আপনি কেননা জানেন সে শালারা বই থেকে তত্ত্ব কপচাবে। অন্যদিকে অবাঙালীদের 'বেওসায়ি' বলে নিজেদের শিক্ষা জাহির করুন। কারণ ব্যবসায় ল্যাং খেয়ে আপনার তো বুকনি ছাড়া কিছু বাকি নেই, সাহিত্যিকের জাত বলে আপনার গর্ব। কারণ পেটে খাবার লড়াই এর চেয়ে আপনার জাত পদ্য লিখতে ভালোবাসে। শরীরের শ্রমের তো দাম নেই আপনাদের কাছে। আপনারা বোঝেন কেবল মগজ। ফলে কেবল লেখা-লিখি। ফলে কেবল পদ্যগদ্য। ফলে কেবল আর্ট। তাই আর্টিস্ট আপনার কাছে বড়ো। আর্টিজান আপনাদের পাত্তা পায়না। পেলেও, আপনার চাই একই রকমের বাঁকুড়ার ঘোড়া। আপনি তাতে অদলবদল হতে দেবেন না। রামকুফের হাত বেঁকানো ন্যালাখ্যাপা মূর্তি চাই। সব কিছু চাই স্ট্রীমলাইনড। আর্টিজানকে বুদ্ধি খাটাতে দেবেন না আপনি। বুদ্ধি খাটাবার কাজ তো লেখকের দার্শনিকের চিন্তাবিদের বুদ্ধিজীবির। অভিধান দেখে দেখে শব্দ ঝাড়ুন। ডিকশনারী আর ছন্দর বই ঘেঁটে ঘেঁটে পদ্য লিখুন। দু চারটে কবি লেখককে গালমন্দ করুন। ঘুরে ফিরে নিজেদেরই লেখা ছাপান। একবার এদলে সই করুন। একবার ওদলে সই করুন। দাদাদের ধরে বইয়ের রিভিউ করান। সভাসমিতিতে রবীন্দ্রনাথের ভাষা চুরি করে বাতেলা দিন। চিংড়ি-ইলিশ-মুর্গি জিতলে মূর্তিফার্তা করুন। পেট গোলমাল হলে বহু জাতিকের বড়ি খান। হাত ধুয়ে এসে গামছায় মুছতে-মুছতে ভাবুন আপনিই প্রতিষ্ঠান বিরোধী। হ্যাঁ আপনিই।

অসময়ের জানলা দিয়ে একরাশ প্রজাপতি

শ্রীধর মুখোপাধ্যায়

এক

গঙ্গার ধারে পরিত্যক্ত গোডাউনের যে ঠেকে রোজ, প্রায়ই, অফিসের পর জমে ওঠে অপ্রাসঙ্গিক বন্ধুত্বের গাঁজার আড্ডা—সেখান থেকে ওভস টেনের লাইন পেরিয়ে শহরের মধ্যে প্রবেশ করে, হাঁটতে হাঁটতে সামনের মধ্যত্রিশের ঈষৎ পৃথুলা, সুশ্রী মহিলাদের গোলাপী ব্লাউজের বাইরে বেরিয়ে থাকা প্রদর্শনীর জন্য অনেকটা উন্মুক্ত, ফর্সা পিঠে আমার জলন্ত ব্লেড চালাতে ইচ্ছে হয়.... খুব —। অসংযম শিখেছিলাম কবে মনে নেই। এখন হাতে... পকেটে.... মানিব্যাগে... ছিঃ কোথাও একটা ধারালো শার্প ব্লেড নেই.... অথচ এমন বসন্তের বিকেলের মত তকে শুধুমাত্র বিন্দু বিন্দু রক্তের বিভিন্ন, ঋজু, সরল ও বক্র রেখাই একমাত্র মানায়।

তখন কেশ করছি চিত্তরঞ্জন এ্যাভিন্যু। অনেক গাড়ি, আলো বাধ্য পশুরা গোচারণ পেয়ে শিথিল থোড়ারে ফিরছে অজস্র কর্কশ শব্দের মত... অসংখ্য; আমিও তাদের ঘর্মাক্ত জামার পাশে নিজের অবিচ্ছিন্ন নিঃশ্বাসকে প্রলম্বিত রাখি।

আজকাল পয়সা বড় কম থাকছে হাতে। 'শ'-এর বিখ্যাত মদের দোকানের পাশ দিয়ে আসতে আসতে মনে হয়.... প্রতি মাসে বই কেনার দরকার নেই, দুহাত খুলে বালকের শ্রীমপ্পানের মত মুহূর্তে মানিব্যাগ শূন্য হয় তোমার হে অবোধ.... আজ মাসের ৯ তারিখ সবে.... ২৫-এর আগে মাইনে নেই।'

কাল চৌরঙ্গীতে শোকেসের কাচে, আয়নায়, এক বিদেশীনির মোজাহীন পাদা পা··· পদযুগল দেখেছিলাম কালো স্কার্টের নিচে।

কি বিদ্ধস্ত সমস্ত রাত। ঐ কালো ব্যবধান পেরোতে পারছে না কবিতার শৈত্যপ্রবাহ বা যন্ত্রণার মুগ্ধ সূচ। সেজন্যই এই পার্থিব সৌন্দর্যের অনুপম মুহূর্তটির স্থান হবে শুধুমাত্র যৌনতা—সর্বস্ব হোর্ডিংএ, হোলো, কাল, আজ, আগামীকাল.... এত সৌন্দর্য্য, এত বৈদিক শুভ্রতা কেবল কাঁচের আয়নায় ... আমার রাত্রে-ই।

*

স্বপ্নের মধ্যে, তন্দ্রাতেও, ঝিমুনিতেও, অযৌন ক্লান্তিতেও ফিরে আসছে বারবার ফরাসী বিপ্লবের জাপান থেকে করানো কালারপ্রিন্ট, রোবস্‌পিয়র, মিরাবো, নেপোলিয়নের দুর্জয় অভিযান, স্টেট জেনারেল থেকে প্যারি কমিউন.... মার্কসীয় বিশ্লেষণ। আমি কি সেদিন মাদ্রিদ বা ভিয়েনায় বসে ফ্রান্সের, মহান ফ্রান্সের মানুষের স্বাধীনতা.... সাম্য.... চাইছিলাম; অথবা লাল গোলাপ শিশির ভেজা-ধৃত, মৃত হচ্ছিলাম মহীয়সী, তন্দ্রালসা, অপাপবিদ্ধা ম্যারি আঁতিয়নেতের সুচারু আঙুলে, ঠোঁটে।

বলা যায় বিপ্লব থেকে সহর যাওয়া। না:। আরক্ত বিপ্লব হাওয়া, গভীর, ভিতরে, ভীরু, নারীর.... ফ্রান্সের ...

*

তাহলে মেহেদি হাসানের গজল শোনাবে তুমি, মানস! ছাখো পাও নাকি টিকিট.... আচ্ছা কারা শুনবে বা দেখতে যাবে? যারা যাবে তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা কি? তাদের পেশা? বয়স? তারা কি সবাই বেবিফুড—অয়েলরুথ—স্যানিটারি ন্যাপকিন—কেন্দ্রিক সভ্যতার মাছ? কাল রাত্রে ঘুম ছিল না। মাইকেল এঞ্জেলো ও পিকাসোর দুটি বিশাল ইলাসট্রেটেড বই সামনে খুলে বসে থাকতে থাকতে দেখলাম মাঝখানের পৃথিবী কেটে যাচ্ছে, আস্তে আস্তে ফাঁকটা বড়, খাঁদ, অনেক উষ্ণ ধোঁয়া, আগুনের ফুলকি, আমি দেখতে পাচ্ছি না কিছুই.... শুধু বিভিন্ন রং সব ছবি ছেড়ে বাতাসে উড়ে বেড়াচ্ছে, পাখনা মেলে, আলাদা আলাদা ভাবে কখনও জড়িয়ে মিলিয়ে বহুমাত্রিক অথবা মাত্রাহীন, মেঘের মত। 'ক্ল্যাসিক্‌স্' শব্দটির প্রকৃত অর্থ কি? তাৎপর্য কি?

নোংরা মাথা বিবস্ত্রা, উন্মাদ যুবতী একখণ্ড নরক, উপুড় হোয়ে প্লাটফর্মের উপর শিয়ালদা ষ্টেশনে মাছি উড়ছে। আমার পাশের ভদ্রলোক যিনি কোন বড়দরের সরকারী চাকর তার চোখ বুকষ্টলের রঙীন ম্যাগাজিন কভারে। ইউনিভার্সিটির ভবিষ্যৎহীন ছেলেটির চোখ তখন জরিপ করছে, লেহন করছে, ওষুধ খুঁজছে উন্মাদিনীর প্রকাশ্য শরীর। আমি শিল্পের মুক্তাবিন্দু বলব কোনটিকে? ট্রেনটা ছেড়ে দিচ্ছে, ছোটাছুটি, চেঁচামেচি.... ছবি দুটোও ছিঁড়ে যাচ্ছে .. অলসভাবে। আমার ভয় করে, পা আড়ষ্ট হোয়ে যায় আবার সেই মেঘ—বিদ্যুৎবাহী, এলোমেলো বাতাস। 'শিল্পের' সন্ধানে একটি নিঃসঙ্গ গাছও অপেক্ষা করে আমরণ। আমি হেনরি মিলারের 'ট্রপিক অব ক্যান্সার' এবং রিচার্ড বাকের 'ইল্যুউশান' দুটো বইকেই অদ্ভুত ভালবাসি।

দুই

মাঝে মাঝে তবু ফিরে আসে.... আসে.... অযোধ্যা পাহাড়ের অ-সভ্য ঝরণায় ভীষণ নগ্ন হোয়ে স্নান। স্বর্ণ রেখার বালিতে মল্লয়া খেয়ে অচৈতন্য পড়ে থাকা টানা সাত ঘণ্টা, একা। আদিবাসীদের নিকোনো উঠোনে বসে ছেলে বুড়ো বউ মেয়ের সঙ্গে মধ্যরাত অবধি হাড়িয়া পান, গর্ভবতী যুবতীকে মা বলে পদচুম্বন, আবার তাদের সবায়ের কাছে ফিরে যাবার আশ্বাস নিয়ে ফিরে এসে কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে থাকা চাঁদের নিচে.... সিংভূম এখনো তোমার কয়েকটি অঙ্গ কামুক হাওয়াখোরদের চোখের আড়ালে পবিত্র কুমারীত্ব নিয়ে ঘুমিয়ে আছে, আমি সেই কবোষ্ণ সতীচ্ছদের নিচে অবিচ্ছিন্ন আশ্রয় পাই.... বারবার....। না অর্থময় সভ্যতা তোমার কোন প্রলোভনই আহত করতে পারবে না আমাকে। আমি বারবার ফিরে যাবো আদিম সময়ের অশ্রুবিন্দু ও শীৎকারের কাছে। .....এসো অপরূপা, মেলে দাও শরীর, আমি কবিতা লিখতে চাইনা, ছবি আঁকতে চাইনা, চড়তে চাইনা ইমপোর্টেড কার বা চাইনা বিন্দুমাত্র সংবাদ হোতে, শুধু তোমার চোখের প্রতিটি পল্লবে সূর্যোদয় হোক, কুয়াশার মধ্যে ভেসে বেড়াক চিরহরিৎ অরণ্যের ভালোবাসা, জলের নীলচে সবুজ গভীরতায় দুলুক পৃথিবীর সর্বশেষ উদ্ভিদ।

তিন

খালাসীটোলায় বাংলামদের আসরে একসময় সময় থেমে যায়। মনে আছে কমলকুমার মজুমদারের 'গোলাপ সুন্দরী' বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গল্প এই কথাটি অবরুদ্ধ গলায় আমি যখন উচ্চারণ করছি তখন আমার বন্ধুরা হো হো করে হাসছে, (হ্যালি'স কমেট.....ইমপিরিয়ালিজম....আলট্রা-লেফটিষ্ট টেররিজম···লেসবিয়ান পিওরিটি (Halley's comet....Imperialism....Ultra-leftist-terrorism.... Lesbian purity....)। 'আমি অন্য এক জনের সঙ্গে থাকবো হয়তো কোনদিন, কিন্তু তোমারও তো একজন আছে—যে তোমার খুব কাছের—তুমি যেভাবে ছাখো। আমি চ্যালেঞ্জ করছি না কিন্তু তুমি পারবে না আমি জানি, আমার সঙ্গে থাকতে.... যদি আমি রাজীও হই... মন খারাপ করো ক্যানো? বন্ধুত্ব শব্দটাকে তো আদিগন্ত বিস্তৃত করা যায়....' ....আমি ....স্বাতী -- স্বাতী ....এক মুহূর্তের কম্পন কেন সমস্ত জীবনের আলুলায়িত সমুদ্রের সমস্ত শান্তি কেড়ে নেয়?

*

এখনো অবধি কোন দার্শনিক জন্মায় নি। বিশ্লেষণ নেই দার্শনিক-ভাবে। অথবা আগুনের বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে থাকা একক মানুষটিই হয়তো, একদিন, কোন একদিন জয় করবে 'সময়'। অথবা কি প্রয়োজন? অতির লবনাক্ত হাওয়া বা একটি সজীব সন্ধ্যা আলাদাভাবে নয়, একই সঙ্গে মনোরম ফুলদানিতে রাখা থাক।

যন্ত্রনার সাপ শীতলভাবে বিচরণ করে শরীরের ভিতর, টের পাই, কেঁপে উঠি, তুমি হারিয়ে যেও না। না। আমি তোমার প্রেমের অনুপম মুগ্ধতা চাইনা, চাইনা সমবেদনা, বা যৌথ বিষন্নতার কফি, শুধু তুমি হারিয়ে যেও না। আমার চোখ শুধু তোমার বৈদিক মন্ত্রের মত সাবলীল পদছন্দ দেখুক....

'....স্বাতী খুব দেখতে ইচ্ছে করল তাই.... কিছু মনে কোরো না.... আমি জানি এভাবে মাতাল হোয়ে আসা খুব খারাপ.... তবু.... স্বাতী.... স্বাতী....'

একটা ট্যাক্সি ও আমার লজ্জা স্বাতীর কাছ থেকে আমাকে বহুদূরে, এক দূরতর নির্জন দ্বীপের দিকে নিয়ে যায়, যেতে থাকে।

"রোজ এভাবে অসুস্থ হোয়ে ফিরছিস! কেন এসব করিস?" মা বসে থাকে। আমি ঝাপসা চোখে রাত ১২টা ২৫ মিনিটে দ্রুত খাবার চেষ্টা করি। আমার খাওয়া হোলে তবে মা খাবে...। মা।

চার

ঘন কুয়াশার মত এক অস্বচ্ছ আবেগহীন অপরাধবোধ প্রতিদিন তার আক্রোশ বাড়ায়। তার মধ্যে আমি কুঁকড়ে ছোট হোয়ে যাই, এক সময় হাত পায়ের বোধ থাকে না, মুখ, চোখ, নাক, চুল সব কিছুর স্মৃতি শুধু জেগে থাকে। আশেপাশের পৃথিবী অবসন্নভাবে ঝুলে থাকে.... তারপর.... একদিন.... একসময় -- শুধু ডিমের সাদা খোলসের মধ্যে 'আমি' এই বোধটুকু নিয়ে আমি বেঁচে থাকি, বাকি.... অন্য সবকিছু গ্রাস করে নেয় সেই এক নীল কৃষ্টালের মত গাঢ় অপরাধবোধ।

দীর্ঘ ৩২ দিন আমি শুধু দমদেয়া পুতুলের মত কাজ করে যাই.... অফিসের পর বাড়িতে ফেরার তাড়া আজকাল আর থাকেনা -- আধ ঘন্টার নিঃসঙ্গতার পরই আমি এক শব্দগন্ধময় স্রোতের মধ্যে ভাসতে থাকি, হারিয়ে যাই। ....তারপর একদিন আবার লেনিন সরণীতে দুপুরে উজ্জ্বল সামুদ্রিক ভালবাসা খেলা করে শনিবার। দীর্ঘ ৩২ এবং এই ৪৩ মিনিট শব্দহীন থাকার পর....

'আমাকে অন্ততঃ একটু ঘৃণা কর.... শাস্তি দাও... এই অবর্ণনীয় প্রাসাদ ভেঙে দাও... জানিনা হঠাৎ মুহূর্তের অজ্ঞান মধ্যযুগীয় আত্মা কখন আমাকে এত প্রেমময়, উচ্ছৃঙ্খল করে.... আমাকে আগত এক ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্র বিন্দুতে নিক্ষেপ করবে বলে ..

'এই সাতদিন থাকবে কলকাতার বাইরে.... ফিরে এসে আবার আমাকে আগের মত... তুমি তো আমার প্রেমিকা নও, স্ত্রী নও তাই এত দাবী করতে পারি... আমি অপরাধী, তুমি আমাকে ক্ষমা না করে শাস্তি দাও, আর সামাজিক, ধর্মীয়, অগুণ্ঠনগুলিকে রক্তলাঞ্ছিত করে মহাপৃথিবীর

বারুদ ও বিষন্নতার শেষ সকালে তুমি আমার প্রথম ও শেষতম বন্ধু থেকো। ....ভাল থেকো.... আমি জানি তুমি আমাকে এত অত্যাচারের পরও প্রথম বর্ষার মেঘের মত ভালবাসো....'

পাঁচ

হালকা আলোয় বসে.... আমি আবার ব্যাকাসের শরণার্থী··· স্বাতী.... I beg your pardon for my... . I beg to kiss your feet.... that's enough. You are my aesthetic blue, my unreasonable and unauthorized love.... come with me I will show you the blue crystals of happiness.... . I am last-est hope of the universe. Swati you are the most unimportant and most scientific Zero in my life.... everyone attens to reach you, the supreme zero. Zero !

The truth, the source of everything, the begining and also the end. Or 'END' is a child's imagination.... you better call in THE INFINITY. You Swati ... you only....

*

কবিতার জন্য যদি মৃত্যুদণ্ড দাও মেনে নিতে পারি। শুধু কবিতার জন্য। আমার চারপাশে শান্ত ভাবে মদ খাচ্ছে মর্গ থেকে উঠে আশা মৃতদেহগুলি! অদূরে কয়েকজন যুবতী শরীরময় অন্ধকার ও শূন্যতা নিয়ে বসে আছে। এখানে এমনই হয়। তারা টেবিলের পাশে ঘুরে গেল অনেকবার.... কি অসহায়, পৃথিবীর ঔদাসীন্যে ক্ষতবিক্ষত তাদের কাঁচের চোখ। একজন পুরুষ, যদি সে আদম শব্দটির ইতিহাস জানে তবে সে কি করে খুঁড়বে এদের শরীর? ...কামনা কি এত দুর্জয় যে ভেঙে দেবে সন্তাপ, সহানুভূতি.... 'ওদের প্রতি সহানুভূতি দেখানোর উপায় একটাই, ওদের ব্রার হুক সন্তর্পনে খোলা....এবং ভারী পার্স.... তোমার মানবিকতার স্যাতসেতে বাতাস ওদের ক্ষুধার সপ্তম নরক... ওদের শীতল করতলে বৃশ্চিক দংশন।' কেউ বলল। চারপাশে তাকিয়ে দেখি কেউ নেই। তবু পারবো না আমি। আমি

ধর্মকে উপেক্ষা করতে পরি, সমাজকেও... কিন্তু... না। চলে যাও ৪০ টাকা কিলোদরে মাংস কেনা যেতে পারে কিন্তু তোমার মাংস সংকুচিত প্রসারিত হয়। তোমার মাংস কাঁদে। কথা বলে ....No I am not at all humanitarian.... 'কিন্তু ওরা অপেক্ষা করছে সকাল থেকে একথালা সাদা ভাতের জন্য........।' So what ? আমার ক্লান্তি আসে। এর থেকে আত্মরতি অনেক জীবন্ত, সুখের, অনুভবের....

সুতরাং আমি....। কফিহাউসে যেতে হবে। যাওয়ার যদিও কোন দরকার নেই। অথচ তোমার চিন্তাকে একবারও সরাতে পারছি না। You are the unsurpassable symbol of dignity, riligion and love (or ENVY).

দু উরুর মাঝখানে অনিদ্রার রাত। Valley of flowers. The Heaven .... No boy the Haven. You must call it ... কয়েক মুহূর্তের নীরবতার জন্য আমি সমস্ত জীবনের ঘাসের মূলের গন্ধ ত্যাগ করতে পারবো না। উচিৎও না। আমি ভালবাসি শরতের শিশির... ভোরের কুসুম প্রকাশ, কিশোরীর পবিত্র সকাল...। ঈশ্বর তোমার মুখে এখন যন্ত্রনার নীল-সবুজ দাগ। হ্যাঁ এইসব সমীকরণের... প্রাকৃতিক সমীকরণের মধ্যেই সেই অপার্থিব সুষমা....

ছয়

শুধুমাত্র কর্তব্য করে যেতে হবে আমায়। হ্যাঁ আমার মধ্যে এক মধ্যযুগীয় বিবেক বসে আছে, কার্ল মার্কসও যাকে সরাতে পারেননি। সেই বিবেক, কেউ বলেছিল ঈশ্বর, তার বিরুদ্ধতা করে জয়ী হতে পারব কিনা জানি না। শুধুমাত্র এই বিষাক্ত বিবেক নামক অত্যাচার যন্ত্রণা দেয় আমায়। দেয়না শান্তি পেতে। দেয়না গন্ধ নিতে অমলিন ঘাসের।

বিবেক। এখনো অবধি পরাজিত আমি তোর কাছে ১৯৮৬-র আফ্রিকান শ্রীধর।

*

তন্ত্রসাধণার নীরব নিস্তরঙ্গ, স্থিতিস্থাপক আত্মাধর্মী জগতের মধে আমি প্রবেশ করি। প্রাথমিক আবর্জনা, বাইপ্রোডাক্ট আমি দুহাতে সরাই। এতে বিচরণ করি এবং এইভাবে একদিন ভারতবর্ষের নিজস্ব সন্তান আদি অনার্যদের সাধন পথ বা জীবনবোধ—যা পরবর্তীকালে, বৌদ্ধযুগে—বিস্তারিত, সংযোজিত এবং বিভিন্ন শেডে পরিদৃশ্যমাণ, তার ধীশক্তি ও ইচ্ছাশক্তির ব্যবহারে ....শুধুমাত্র কর্ত্তব্য কোরে যাব আমি.... হ্যাঁ.... বিবেক.... যা ঈশ্বর... তার বিরুদ্ধতা করব না আমি অথবা শুধু-মাত্র এই বিষাক্ত বিবেকই আমাকে যন্ত্রণা দেয় দেয়না শান্তি পেতে - দেয়না গন্ধ নিতে অমলিন টিউলিপের....
আর মা.... বাবাও.... কিছুটা....

তবু মা.... তুমি মরে গিয়ে ভারতীয় জন্মান্তরবাদ যদি সত্য হয় আমার মেয়ে হোয়ও··· পাগলী মা আমার....

বিবেক একমাত্র তোর কাছে পরাজিত আমি ১৯৮৬ র উদ্দাম শ্রীধর।
তন্ত্রসাধনার নীরব, নিস্তরঙ্গ, স্থিতিস্থাপক, বিজ্ঞানধর্মী জগতের মধ্যে

আমি প্রবেশ করি। সামনে আবর্জনা, বাইপ্রোডাক্ট এসবের অত্যাচার আমি ঘাঁটি, এতে বিচরণ করি এবং এইভাবে একদিন ভারতবর্ষের আদি এবং অনার্য সাধনা যা পরবর্তীযুগে,—বৌদ্ধযুগে, বিস্তারিত, সংযোজিত এবং বিভিন্ন শেডে পরিদৃশ্যমান তার ধীশক্তি ও ইচ্ছাশক্তির ব্যবহারে চেতনা বহির্ভূত চেতনার মধ্যে আশার সংকল্প ও পথ আমাকে চমকে দেয় ।

তুমি কখনো অনুসরণ করতে পারো না। কেবল, শেখো, ভাবো, গভীরতার আত্মস্থ উপলব্ধি পাও, সেই উপলব্ধ অনুভূতিতেই বিচরণ করতে ভালবাস।

হয়ত তাই—ই .... তবু ... ...
চেতনা বহির্ভূত চেতনার মধ্যে আশার সংকল্প ও আমন্ত্রণী পথ আমাকে চমকে দেয়।

'তুমি কখনো অনুসরণ করতে পারনা। কেবল শেখো, ভাবো, গভীরতার আত্মস্থ উপলব্ধি পাও এবং সেই উপলব্ধ অনুভূতিতেই নিমজ্জিত থাকতে ভালবাস গভীর জলজ তৃপ্তিতে।' একজন বলল আমি তাকে চিনিনা তবু.....হয়ত তাই-ই!

জাগতিক বোধগুলির অত্যাচার বাড়ে আমি ব্যাকামের কাছে যাই। তার সহচরী—অপার্থিব মেনাডরা—তাদের সুন্দর রুক্ষ অধনগ্নতাকে আমার কাছে সমুৎপন্ন করে··· তারা আমার চারপাশে নাচে গায়.... কিম্বা সেই ৭৭ এর ভাঙ্গা গোডাউনে গঙ্গার হাওয়ায় জলে ওঠে অনার্য গন্ধ। লাল হোয়ে যাচ্ছে চোখ। গাঁজার নীল ধোঁয়া অস্তগামী সূর্যকে গঙ্গার পশ্চিম দিকে রেখে বিভিন্ন সাপের মত আকাশে উঠে যায়। আমি গাঢ় বিষন্নতা ও একঘেয়েমিকে এভাবে শাসন করি তাদের ওপর এ্যানেসথেসিয়া প্রয়োগ করি - আমি স্বাধীনতা ফিরে পাই, চিন্তায়... অন্ততঃ চিন্তার আকাশে আমি মুক্ত আলোক কনিকা হয়ে যাই।

সাত

কোন এক বিন্দুতে স্থির নির্বেদ নেই আমার। বিচরণ, শুধু বিচরণ। দেখি একজন শ্রীধর একসময় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতির সীমার বাইরে, ভোরের আকাশে খেলছে, দুলছে, ভাসছে। এই শরীরতর ক্ষেত্রেই আমার নাম রেজিষ্ট্রিকৃত হয়ে যায়। কোন এক বিশেষ নয় : বহু, বহুতর বিষয়ের বিভিন্ন আলোকগুলি সর্বশেষ এক জায়গায়—এক অতি পার্থিব প্রাকৃত সৌন্দর্যের সন্ধ্যায় মেশে, বিকশিত হয় ;—আমি সেই আকাশের আলোয় স্নান করি পান করি, নিজেকে শুদ্ধ করি।

মধ্যরাতে কলকাতার নির্জনতম সম্ভ্রান্ত রাস্তায় দাঁড়িয়ে মনে হয়, বিশ্বাস ও বোধ দৃঢ় হয়—এই পৃথিবীর কোন শহরে গ্রাম নারী বা পাথর আমার আশ্রয় নয়.... আমার আশ্রয়, অবলম্বন, ভেঙে-যাওয়া, বেঁচে-ওঠা সব এক নিষিদ্ধ, আতসূক্ষ্ম অনুভূতির পৃথিবী।

একসময় ফিরে আসি ঘরে, তখন অনেক রাত, ঘুমন্ত পৃথিবী, ঘুমন্ত জীবনযাপনের সমূহ ধুলো ও স্বর্ণবিন্দু। প্রেম, হত্যা, ব্যাভিচার, দাসত্ব, বিবেক, কর্তব্য, অধিকার, স্নেহ, ভালবাসা, ঘৃণা, ব্যবসা সব কিছু তখন—সমস্ত দিন

আমাকে অধিকার করে থাকার পর এখন সীমান্তে। মুক্ত আমি। একা চার দেয়ালের মধ্যে, অথবা মহাকাশে। আমার টেবিলের, র‍্যাকের' আলমারির বইগুলো কথা বলতে শুরু করে। ক্যাসেট প্লেয়ারে অসাধারণ সুর নেচে যায়, সুগন্ধ ভাসে চরাচর জুড়ে।

আমি আমার সামাজিক আমিকে তখন ফেলে এসেছি অনেক দূরে.... পিছন ফিরে তাকে দেখতে পাই না। ভাল লাগে।

আমি স্বচ্ছ, রামধনুরঙা ডানা পরে নিই.... এবং ... শরীরটাকে টানটান করে টেক্ অফ্ করি, উঠতে থাকি ওপরে, গতি ...আরও গতি....একসময় পৃথিবী নিচে কেবল একটা গ্লোব—ছেলেবেলার। আমি আরও উঁচুতে। আকাশে, নীলের মধ্যে চলে যাই। এবং শরীর হালকা করে, ডানা প্রসারিত করে ভাসতে থাকি ....আ :···কি অসীম ভালবাসা, তৃপ্তি.... ভাসি.... ভাসতে থাকি। শব্দ গন্ধবর্ণ তাপ-উত্তাপহীন এক শূন্যতায়..... শূন্যে..... ছ আনসারপাসেবল জিরো..... ছ গোল ..... দ্য ইটারনিটি.....

———

গল্প

* * * এবং মানসিক ব্যাপার ট্যাপার

সুমন্ত্র সরকার

আলো তখনও কোথাও প্রতিফলিত হয়নি। এবং ভৈরবীর সুরটুর কোথাও শোনা যাচ্ছে না, তবে সময়টা নাকি এখনই। এ সময়ে মনটা বড় পবিত্র থাকে। ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করতেই ইচ্ছা হয়। মনের পবিত্রটাই আমার কাছে সবচেয়ে বড় জিনিষ। পবিত্র মন নিয়ে আমি কাউকে ভালবাসতে চাই। এর কিন্তু কোন প্রতিবিম্ব নেই; কিন্তু স্বপ্নটা আমি দেখি। দেখতে কোন দোষ নেই। এই মুহূর্তগুলোকে স্মরণীয় না করতে পারলে কিংবা কোন কিছু বাস্তব না হলে সব ক্রমাগতই অপ্রাকৃতিক অপার্থিব হয়ে যাবে। সেই জেনে আপাততঃ আমি নিশ্চল, ম্রিয়মান, বিমূঢ় কিন্তু কিং-কর্তব্য নেই। আমার চারপাশের পরিবেশ এক নির্বোধ গাম্ভীর্য নিয়ে কাল গণনা করছে। কোথাও শূণ্যতা নেই। এ সময়ে আমার দুঃখও নেই, সুখও নেই। আমার মনটাকে কোমল নিখাদে অভূতভাবে ভাসিয়ে রেখেছি। যা সর্বত্র বিরাজমান।

খেয়াল হল অনেক্ষণ যাবৎ পাখীরা সরব। ক্রমে শিউলিফুলের গন্ধমাখা মিষ্টি রোদ দেওয়ালে দেওয়ালে ধাক্কা খায়। সময়টা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। সেই শব্দে প্রাণিজগত জেগে ওঠে। আমার ঘুম পায়। এইবার আমার চারিদিকে ভীষণ গণ্ডগোল শুরু হবে। তার আগে আমার ঘুমিয়ে যাওয়া একান্ত দরকার। সকালের কুয়াশা ভেজা ঠাণ্ডা হাওয়া গায়ে লাগাতে জানালাটা বন্ধ করে দিলাম। কারণ বাঘের হিংস্র নোখ বাতাস ডিঙ্গিয়ে আমাকে তাড়া করছিল। ঘরটা ফুটো অন্ধকারে ভরে গেল। আমি এই বহুছিদ্র অন্ধকারকে ঢাকবার চেষ্টা করলাম না। কারণ আমাকে উদারমনের পরিচয় দিতে হবে।

আমি আজ মৃত চাঁদের আত্মাকে ঘুম পাড়াব এই ভেবে আমার মুখ আমার অজান্তেই কঠিন হয়ে গেল। আমার মুখমণ্ডলের কাঠিন্য ঘরের সমস্ত অন্ধকারকে চেপে ধরতেই সব কিছু দৃশ্যমান হল। যা আমার খুব একটা প্রয়োজন ছিল না। আমি এখন বিছানার উপরে দুচোখের পাতার মধ্যে একটা রেখা টেনে এক করতে চাই। কারণ আমার অজান্তেই ওপরের

পাতাটা ভীষণ ভারী হয়ে গেছে। কিন্তু মন এতক্ষনে ছাড়া পেয়েছে। গলাটা শুকনো লাগছে একটু জল খাবো? না কফি? ডায়াবিটিজ হলে নাকি চিনি খেতে নেই। শয়তান কেন ভগবানের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে? দেশের অবস্থা খুব খারাপ। সবাই দেশ নিয়ে বড় বেশী ভাবে, কিন্তু দেশটার উন্নতি আর হয় না। এইভাবে আমার শরীরে দীর্ঘ খরার পর বৃষ্টির শান্ত জল যখন নামছিল তখন হঠাৎ দরজায় সমুদ্রের তীরে ঢেউ ভেঙে পড়ার মত কড়ানাড়ার শব্দ হল।

কে?

উত্তর নেই।

দরজা খোলা আছে।

একি ঘর অন্ধকার করে বসে আছ কেন? সমস্ত ঘর বিস্ময়ে ভরিয়ে দিল সুদেষ্ণা। আলো জ্বালাল। অন্ধকার চোখে উঠে বসলাম। কি ব্যাপার? কি আবার? তোমাকে দেখতে এলাম। সুদেষ্ণার গায়ের থেকে অ্যাভনের সুখি গন্ধ অনুভব করতে করতে চোখে আলো জ্বাললাম, আর দেখার লোক পেলে না?

মুহূর্তে ফ্রিজশট্ হয়ে নিয়ে আবার হেসে সুদেষ্ণা বলল, না, তুমিই তো আমার একমাত্র দেখার লোক। সুদেষ্ণার টুথপেষ্ট রংএর কাপড়ে একটা নীল মাছি দেখতে দেখতে বললাম, কিন্তু তুমি তো আমার দেখার লোক না। আর তা ছাড়া এখন তোমাকে দেখতেও ইচ্ছে করছে না। সুদেষ্ণার ক্রীম মুখের রং প্যান্টাল, যা নাকি গোলাপী রংকে মনে পড়ায়। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার হাতে ঘরটাকে ছেড়ে দিয়ে একগাদা কাঁচের বাসন ভাঙার শব্দে ঘরটাকে ভরিয়ে দিয়ে সুদেষ্ণা চলে গেল। আকাশে একই সঙ্গে একটা জেট প্লেন যাওয়ার শব্দ পেলাম। আবার যথাস্থানে ফিরে এসে চোখের পাতা দুটো এককরে ভাবতে লাগলাম, সুদেষ্ণাকে এসব কথা না বললেই হত। ছিঃ ছিঃ আমার সম্বন্ধে কি ভাবল। বুকের ভেতরে সেকেণ্ডের কাঁটা দ্রুত এগিয়ে যায়। যাক্‌গে ওসব, সবই.....।

দরজায় এবার শান্তিপ্রিয় অথবা যুদ্ধবিরোধী পাগীদের গলার আওয়াজের মত কড়ানাড়ার শব্দ হল।

কে?

উত্তর নেই।

দরজা খোলা আছে।

একি ঘর অন্ধকার করে এখোনো শুয়ে আছে? উদ্বেগে সমস্ত ঘর ভরিয়ে দিল অনুলেখা। আবার চোখে অন্ধকার নিয়ে উঠে বসলাম; কি ব্যাপার? তোমাকে দেখতে এলাম, কেমন আছ? অনুলেখার মুখের মধ্যে লুকানো কয়েকটা মুক্তো দেখতে পেলাম।

আমি ভালো নেই অনু। আমাকে এখন প্লিজ ডিস্‌টার্ব কোর না। পরে এসো। আমি এখন ঘুমাবো।

ঠিক আছে তুমি ঘুমাও। আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি। না অনুলেখা, তোমার উপস্থিতি গ্রীষ্মের দুপুর রোদের পিচগলা গরমের চেয়েও অস্বস্তিকর। তুমি এখন যাও।

ঘরের মধ্যে শীতকালের গাছ হয়ে খানিক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে মুখের রং তিতিরের বুকের মত কোরে অনুলেখা দরজা খুলে বাইরে জমাট দালদার মধ্যে হারিয়ে গেল। রাস্তার ট্রাফিকের আলোটা এত তাড়াতাড়ি সবুজ হবে আমি ভাবতেও পারিনি। আবার নিজের জায়গায় ফিরে এলাম। চোখের দু'পাতার মধ্যে সরলরেখা টেনে ভাবতে লাগলাম, অনুলেখা আমাকে ভুল বুঝলো নাতো? ব্যাপারটা সত্যই দৃষ্টিকটু হল। বুকের মধ্যের মেল-ট্রেনটা ততক্ষণে অনেক এগিয়ে গেছে। আমি কিন্তু .....

দরজায় দুরন্ত বর্ষার মত কে যেন কড়া নাড়ল।

কে?

কোন উত্তর নেই।

দরজা খোলা আছে।

আরে এত সকালেও ঘর অন্ধকার করে ঘুমোচ্ছ? তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না।

আমার আগেই মনীষা এই কথাটা বলে দিল। মনীষার মুখে কচি বাঁশপাতার মিষ্টি গন্ধ সত্ত্বেও আমি শুয়ে শুয়ে বললাম, মনিষা তুমি যেখান থেকে

এসেছো সেখানে ফিরে যাও। চোখের ভাষা পাল্টিয়ে ও বলল, তার মানে? মনীষার খোপায় একটা হলুদ রংএর ফুল; যা ওকে খুব সুন্দর মানিয়েছে, আমি উঠতে উঠতে জিজ্ঞাসা করলাম, তার মানে তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে? দেখতে পেলাম খোপার হলুদ ফুলটা লাল রং নিচ্ছে যা ওকে একদম মানাচ্ছে না। তবুও মুখে হাসি এনে বলল, কেন চারমিস্ ট্যাক্তের কৌটোয়। সঙ্গে সঙ্গে শয়তান আমার দেহটাকে তামার পাত বানিয়ে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক এক করে দিল। আমি প্রচণ্ড শব্দে ফিউজ হবার সঙ্গে সঙ্গে মনীষা মোমবাতি কেনার জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমি জানি ও আর ফিরবে না।

কিন্তু আমি আর নিজেকে সামলাতে পারলাম না। ড্রয়ার খুলে ঘুমের ওষুধের শিশিটা বের করলাম। দুর্দান্ত গতিতে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মাইল দূর থেকে কয়েকটা নক্ষত্র ছুটে এসে আমার শরীরে মিশে গেল। আমি ফ্রিজ খুলে ঠাণ্ডা হাত পা গুলো আমার শরীরে লাগিয়ে নিলাম। আমার চোখের সামনে ততক্ষণে কালীপূজার রাত্রি। আমি অন্ধকার ঘরে ভেঙ্গে পড়ে, মাথার মধ্যে অজস্র লেদ মেসিনের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আস্তে আস্তে গলতে শুরু করল। অন্ধকারটাও আমার সঙ্গে তাল রেখে আমার চোখের সামনে আসতে শুরু করল। বাস্তুসাপের কাছে আমার চোখের মণিদুটো জমা রেখে, আমি পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চেপে সাতসমুদ্র তের নদীর পারে রাজকন্যা খুঁজতে বের হলাম।

ফুটপাতে জ্যোতিষীর সবুজ টিয়াপাখী আস্তে আস্তে আবার তার খাঁচায় ফিরে গেল।

কবিতার প্রতি আক্রমণ

এ্যালেন গ্রীন্সবার্গ

এই সময়ের ইতিহাস আসলে চূড়ান্ত ষড়যন্ত্রের ইতিহাস। প্রতিটি মানুষের মধ্যে যে গুণ অবিচ্ছেদ্যভাবে রয়েছে সেই নির্মল ও সুন্দর মানবিক অভিব্যক্তি এবং সমবেদনশীলতাকে সমূলে ধ্বংস করে মনুষ্যত্বের উপর চক্রান্ত করে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে যন্ত্রবৎ চেতনার স্তর। মননশীল ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রতাকে দমন করার কাজও প্রায় সমাপ্ত। 'মাস কমিউনিকেশন (জন-সংযোগ) নামক পন্থার মাধ্যমে আমাদের চেতনাকে যা খাওয়ানো হচ্ছে, একমাত্র তার উপর নির্ভর করেই আমাদের জানতে হচ্ছে এই মুহূর্তের ইতিহাসগত পরিসংখ্যান। প্রকৃতপক্ষে এই মাধ্যমটিতে একান্ত নিজস্ব গভীর সংবেদনশীলতার সঙ্গে বাস্তবতার স্বীকৃতি নিষিদ্ধ, দমিত ও বিক্রপিত।

জাতীয় অবচেতনার বিশাল নরকে আজ আকস্মিকভাবেই অন্তর্দৃষ্টির জরুরী প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কেননা এই নরক এখন স্নায়ুহানিকর গ্যাস, পৃথিবী ধ্বংসকারী বোমা, ঈর্ষাকাতর অমলাতন্ত্র, গোপন পুলিশী ব্যবস্থা, ঈশ্বরের দরজা উন্মীলনকারী মাদকদ্রব্য, অজানা রাসায়নিক ভীতি ও দুঃস্বপ্নের দ্বারা পরিপূর্ণ। আর সেই সঙ্গে আমেরিকার জন-চেতনার মধ্যেও ফাটল ধরেছে। কেননা 'জন-সংযোগ' (Mass-communication) মাধ্যমটি কেবল হাতের কাছে পাওয়া কার্যগত বাস্তব স্তর পর্যন্ত যোগাযোগ সাধন করতে সক্ষম। কিন্তু জীবনের রহস্যময় অবচেতনতাকে কেউ জানতে পারে না। আমেরিকার কেউই জানে না কাল কি ঘটবে। কারুরই বাস্তব নিয়ন্ত্রণ নেই। প্রকৃতপক্ষে আমেরিকার এখন স্নায়বিক পতন ঘটছে।

কবিতা হচ্ছে মানুষের ব্যক্তিগত অন্তর্দৃষ্টির দলিল যা তার আত্মার নিভৃতে গোপন থাকে। মানুষের স্রষ্টা এই জগৎ-আত্মার চোখে প্রতিটি ব্যক্তিই সমান। হ্যাঁ এই পৃথিবীরও আত্মা রয়েছে।

আমেরিকায় এখন স্নায়বিক বিপর্যয়তা চলছে। আরো অনেক জায়গার মত সানফ্রান্সিসকোও একটি জায়গা যেখানে কয়েকজন কবি এবং ব্যক্তি জন-

চেতনায় চিড় ধরানোর মাধ্যমে সাহসের সঙ্গে নতুন আলোর সন্ধান করছে। তারা সরকারের স্বরূপের মধ্যে, ঈশ্বরের স্বরূপের মধ্যে, এবং নিজেদের স্বরূপের মধ্যেও অন্তর্দৃষ্টির প্রতিফলন ঘটাচ্ছে। তাই এই নগরের কবিদের ভিতর উল্লাস, হতাশা, ভবিষ্যৎবাণী, অত্যধিক স্নায়ুর চাপ, আত্মহত্যা, গোপনতা এবং জন-স্ফূর্তি ইত্যাদি ব্যাপারগুলি রয়ে গেছে।

যে সব মানুষের ব্যক্তিগত বোধসমূহ অত্যন্ত দুর্বল এবং 'মাস-কমিউনিকেশনে'র প্রভাবে যাদের চেতনা এক যান্ত্রিক রূপ নিয়েছে তারা কবিদের আত্মদৃষ্টিকে অবহেলা ও অস্বীকার করে। পুলিশ ও সংবাদপত্র এ ব্যাপারটিতে এগিয়ে রয়েছে। এখন হলিউডের চলচ্চিত্র-নির্মাণকারীরাও জঘন্য যান্ত্রিক চেতনার চলচ্চিত্র তৈরীর জন্য প্রস্তুত।

কবি এবং তাদের সমমর্মীরা, যারা তাদের কার্যধারার সমান অংশীদার, যারা পোষাকে, ব্যবহারে, সাজ-সজ্জায় কোন বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ করে অথবা হিপিরা, এখন উপহাসের বিষয়। আমাদের এই যান্ত্রিক চেতনাকে পরিবর্তিত করার অন্তর্দৃষ্টি লাভের জন্য যারা কোন হিতৈষী মাদক গ্রহণ করে, পথে পথে পুলিশ তাদের হন্যে হয়ে খুঁজছে, অত্যাচার করছে। এমন কি অনেককে যাবজ্জীবন কারাবাস ও মৃত্যু ভয়ও দেখানো হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের উৎসাহে মাদক সম্বন্ধে জনগণের ব্রেনওয়াশ করতে, আধ্যাত্মিক অনুসন্ধান যাদের অসুস্থ করে তুলেছে সেইসব নেশাগ্রস্তদের ধ্বংস করতে, এবং এ বিষয়ে ভীতি ছড়াতে প্রতিটি রাজ্যে এক বিশাল ধর্ষকামী পুলিশী অমলাতন্ত্রের অভ্যুদয় ঘটেছে।

বিরক্তিকর একঘেয়ে যান্ত্রিক যৌন-জীবন থেকে যারা সরে এসেছে যারা কেবলমাত্র অর্থের জন্য কাজ করবে না অথবা তুচ্ছ মিথ্যা কথা বলা আর পরিশ্রম করে অস্ত্র তৈয়ারী করা যাদের ইচ্ছে বিরোধী অথবা হত্যা ও ভীতিপ্রদর্শনের জন্য যারা সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করতে ইচ্ছুক নয়, কিম্বা যারা ধীরে-সুস্থে চিন্তা করে কল্পদৃষ্টির মাধ্যমে তাদের নিজস্ব সুন্দর ধারায় কাজ করে চলে, গণতন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রকাশ্যে সত্য ভাষণ দেয়—

আজকের আমরিকায় তাদের মনস্তাত্ত্বিক স্বাধীনতা কতখানি? আমেরিকা বলতে এখন সেই দেশকে বোঝায়, যে তার অর্থনীতির বৃহৎ অংশ যুদ্ধের জন্য, মানসিক ও প্রযুক্তিগত প্রস্তুতিতে ব্যয় করছে।

সাহিত্যে এসমস্ত অন্তর্দৃষ্টি সমূহের প্রকাশ ঘটলে তা নিয়ে উপহাস করা হবে, ভুল সমালোচনা করা হবে। তাছাড়া যন্ত্রব্য জন-সংযোগ প্রতিষ্ঠানের কাছে একদল মধ্যবিত্তের ভীতিময় আনুগত্যের ফলে শর্তহীন বা আপোষহীন স্বতন্ত্র অভিব্যক্তি ও সহানুভূতি থেকে তারা (মধ্যবিত্তরা) দূরে সরে আছে। এইসব মধ্যবিত্তরা হচ্ছে সাংবাদিক, ব্যবসায়িক, প্রকাশক, গ্রন্থ সমালোচক, সাহিত্যের অধ্যাপক প্রভৃতি। কবিতাকে ঘৃণা করা হচ্ছে। সমস্ত সাহিত্য সমালোচনার স্কুলগুলি এটা প্রমাণ করতে একেবারে উঠে পড়ে লেগেছে যে, মনুষ্য চেতনার নিঃস্বর্ত সত্তা অলীক মাত্র। সানফ্রান্সিসকোতে কবিতার নব-জাগরণ—পূর্বসূরীদের দ্বারা কুৎসিত ও ক্রুদ্ধভাবে, ঈর্ষা ও বিষাদের সঙ্গে প্রতিবাদের মাধ্যমে অভ্যর্থিত হচ্ছে।

আর উৎপীড়নতো রয়েইছে। পুলিশ, কাস্টমস্ অফিসার, পোষ্ট অফিস কর্মীরা, মহান বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অছি পরিষদের সদস্যরা সকলেই উৎপীড়ন করছে। এটা আর কিছুই নয়। ক্ষমতাপ্রেমী যে কেউই, সেরকম কোন একটা ক্ষমতাসম্পন্ন জায়গার অধিকারী হলে সেখান থেকে সহজেই সে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির, বিভিন্ন মতাবলম্বীর, মানুষদের ধাক্কা টাক্কা দিতে পারে।

বস্তুতান্ত্রিক আমেরিকা পাগল হয়ে যাচ্ছে। পুলিশতান্ত্রিক আমেরিকা, লিঙ্গহীন, আত্মাহীন আমেরিকা তার মিথ্যা অহংকারগুলিকে রক্ষা করবার জন্য প্রস্তুত।

চেতনার জগতে একবার যারা প্রবেশ করেছে, তারা জানে, আমেরিকার এই জাগতিক কর্তৃত্ব-সুলভতার পেছনে এক বিশাল হাসি অপেক্ষা করছে। জীবন অথবা মৃত্যুতে, কোন না কোন সময় প্রতিটি মানুষকে একদিন সেই চেতনার ভিতর প্রবেশ করতে হবেই।

আমেরিকায় কত-সংখ্যক ভণ্ড রয়েছে? ভীতু-ভেড়ার দলের সংখ্যাই বা কত? পৃথিবীতে শিল্পের প্রকাশকে রুদ্ধ করতে পারে কে? কোন্ অধিকারে ষড়যন্ত্রকারীরা আমাদের চেতনা, আমাদের ইন্দ্রিয় আনন্দ, আমাদের ভিন্ন ধর্মী শ্রম, ও ভালবাসার ধরণ স্থির করে দিতে সক্ষম? আমাদের যুদ্ধের নির্ধারণ কোন শয়তান করে দেবে?

আমরা কবে সেই আমেরিকাকে আবিস্কার করব, যে কখনও তার হৃদয় দেবতাকে অস্বীকার করবে না? ঈশ্বর চেতনা ধ্বংসকারী অর্থ, পুলিস আর লক্ষ হাতের বিরুদ্ধে যে আমেরিকা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত? যে কবিতা পৃথিবীর প্রতিটি ধুলিকণার ভিতরে কেঁদে কেঁদে ঈশ্বরের মহিমা গেয়ে বেড়ায়, কে সেই সুন্দর কবিতার মুখে থুথু ছেটাতে পারে?

১৯৬৯ সালে প্রকাশিত গীন্সবার্গের "Poetry, Violence and the Trembling Lambs" গদ্যটির বঙ্গানুবাদ। অনুবাদ—**মনীশ সিংহ রায়।**

———

॥ এক অদৃশ্য আত্মার ছটফটানি ॥
অজিত রায়-এর
অচলিত গদ্যে চোখা উপন্যাস
আমি ধর্ষণের পক্ষে
প্রকাশের পথে

কবিতাগুচ্ছ

তাপস চক্রবর্তী

এ শতাব্দীর শেষ তাপস

আমার একান্ত কোনো গোপনীয় আবরণ নেই—যা দিয়ে এই মুহূর্তে
আমার দূষিত রক্ত ক্ষরণ লোকচক্ষুর আড়ালে রোধ করা যেতে পারে,

তবু আমি এখন, পরিশুদ্ধ মাটির খুব কাছে—মৃত্যুতীর্থের পথে
নগর প্রাকার অতিক্রম করি নিঃশব্দে; অবশ্য তুমি কতটুকু কুমারীত্ব নিয়ে
আমার অপেক্ষাতে ছিলে—এ-এখন আমার প্রশ্ন নয়; তবে
আমার চিতাভস্ম সিঁথিতে এঁকে-এ শহরের প্রতিটি পতিতা পল্লীর নারী
রাত অভিসারী স্বামীণ রূপে আমাকে বরণ করেছে—এই মুহূর্তে।

এক্ষেত্রে, পাপ, পুণ্য, প্রেম, ভালোবাসা, সত্য, মিথ্যা—এসব শব্দবন্ধ গুলি
আমার কাছে—অর্থবহ নয়; যে ক্ষেত্রে—থালাসীটোলার টেবিলে
আকণ্ঠ মদ্যপানে, একান্ত একাকীত্বে উবু শান্ত হয়ে পড়ে আছে—এ শতাব্দীর
—শেষ তাপস।

একান্ত প্রথাগত আত্মসম্ভাষণে

আত্ম প্রবঞ্চক হতে থাকো, বেতস লতাগুল্মের দিন যাপনে
অতন্দ্র ধাতুবিলাপ, পরিপার্শ্ব শব্দকোষে অনন্ত আঘ্রাণী আর্তনাদ;
স্বপ্নপ্রবণ রাত্রি মৈথুনে প্রাণান্ত জীবন আমাদের এখানে নিঃশব্দে।

অথচ এই শৈথিল্য, কবন্ধ জন্মসূত্রে—কি ভীষণ বিমুগ্ধ
প্রথাগত আমাদের নিয়ে—মধ্যবয়সিনী গর্ভিনী এ ভারতবর্ষ।

প্রতিবিম্ব

নিজস্ব প্রতিবিম্ব থেকে বহুকাল দূরে সরে আছি—অথচ জানি
আজ রাতে আমাকে নীলাম করে দেবে তুমি ; ঐ হাঁকে সতত মালার
পদ্মাতরী, তোমার আকাঙ্খিত সাফল্যের মুদ্রাগুলি তোমাকে দেবে—অহরাত্রি
তেজস্ক্রিয় রতিগ্নি ; আর আমি বার বার নতজানু হয়ে দাঁড়িয়েছি—
নির্ধারিত একই বৃত্তে পুরযাদুক্রমে স্থবির অনন্ত সময়ের কাছে।

অথবা হৃদয় খুঁড়ে—প্রতিবেশীহীন শূণ্যতায় সাড়ে তিন হাত জমি
রেখেছি—সযত্নে নিজের জন্যে ; আর আমার ভিতর একান্তই যে আমি
তাকে তুমি—নিরিড় চুম্বনে কখনো করেছো আত্মঘাতী, হায় নিয়তি !

এভাবে আমার অন্ধকার অলিন্দে হঠাৎ জলে ওঠে নীল আলো—ইতস্তত
অপলক অস্তিমে নিজস্ব সমাধিক্ষেত্রে দেখি—স্নিগ্ধ মৌনতায় স্থির

—প্রতিবিম্ব।

দণ্ডিত প্রণয় ও গর্ভমুক্তির নার্সিংহোম

স্বপ্নবিভোর মধ্যরাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে ছিল—কতগুলো
মোহমুগ্ধ আঙ্গুল ; অথচ আমার আরাধ্য প্রেমিকার মহার্ঘ উরু
এবং উরুসন্ধির মধ্যখানে—আমি নয়, অন্য পুরুষ দৃশ্যপটে।

তবু আমার এ শরীর পণ করেছে—আমার প্রেমিকার গর্ভবাসে কিছুকাল
থেকে আসবে ; এক্ষেত্রে যথারীতি আমারও ঠিকানা পরিবর্ত্তন হয়েছে
খালাসীটোলা, কক্ষিহাউস, অফিস কিম্বা কলকাতার নিষিদ্ধ পল্লীতে
আমাকে পাওয়া না গেলে—কোন গর্ভমুক্তির নার্সিংহোমে
পিতৃ-মাতৃ পরিচয়হীন সদ্যজাত আরক্ত তাপসকে দেখতে পাবে।

আর তার সবুজ কুমারী স্বর্ণচপলা প্রেমিকারা পূর্ণবার দাম্পত্য জীবনে
অভিনাটকীয় স্বীকৃত প্রথম সন্তানের জন্ম দিচ্ছে—একান্ত নির্বিঘ্নে।

সে দিন এমনই মধ্যরাতে

সে দিন এমনই মধ্যরাত ছিল, যাবতীয় সংশয়ের খিলান তুলে
এ পৃথিবীর শুদ্ধতম পুরুষ মধ্যরাতের জানুসন্ধির অন্ধকারে—স্বৈরাচারী
রাতগণিকার সাথে—তেজস্ক্রিয় রতিকাম সম্পন্ন করে।

অথচ তার ঘরেতে ছিল—আসন্ন প্রসবা নারী, ইজেল সর্বস্য দুহিতা সুন্দরী
এবং পিতৃপুরুষ সভ্যতার ঐতিহ্য অনুযায়ী যুবতী বেশ্যার মাংস ক্রয় করার
বহুবিধ সাধ্যবিপনী ; ও সন্তান ধারণে সক্ষম এ-দূরবিনীত ধরিত্রী।

ক্রমে-ক্রমে রাত্রি বাড়ে যোনিরেখার ত্রিভুজ ভূমে, জীবন মৃত্যু মিথুন দীর্ঘ

—ধাতুকামে

ঋতুমতী মহাজাগতীক গনীকাদের অন্তর্গৃহে সৌরবীর্যপাতের তপ্ত লাভায়
আমাদের আদিম সন্তানের আবার পুনর্জন্ম হবে—অগ্নিভ্রূণে

—এই চরাচরে।

এখানে আরোগাঢ়-গূঢ় আত্মহননের ব্যূহউৎসবের যোজন-যোজন দূরের

—কেন্দ্র বিন্দুতে

এ পৃথিবীর অনাত্মীয় শুদ্ধতম পুরুষ ভস্মিভূত হতে থাকে—সবার অলক্ষে ;

—রাত্রি তখন

মহাবহ্নিমান হতে-হতে ব্যথিত মাটির খুব কাছে দীর্ঘ বাহুবেষ্টনে সুবর্ণ

—সেতুবন্ধন করে।

তিমির দেব

অলঙ্ঘ্য আহ্বানে

ঘড়ির কাঁটা চুঁইয়ে নেমেছে অন্ধকার
অন্ধকার
দুষ্প্রবেশ অরণ্যের মতন আন্তরিক
শারদীয় অরণ্যের মতন জীবন্ত

প্রতিশোধস্পৃহ বীর্যবান অরণ্যের অন্ধকারে
ক্রমশঃ বাড়ছে এক শিশু
সময়ের অলঙ্ঘ্য আহ্বানে
ক্রমশঃ তুলছে তার মাথা……

কানীন বালক স্বপ্ন দ্যাখে

বুকের মধ্যে ছলাৎ-ছলাৎ শঙ্খ জমে
বুকের মধ্যে মেঘের রসের মুক্তো জমে
নির্বান্ধব, শুন্য দুপুর—
কামুক মাটি স্বপ্ন দ্যাখে গর্ভিনী মেঘ

ভয় কি আমার ! ভয় কি আমার !....

ঘরের মধ্যে ঘরের মধ্যে ঘর ভেঙে
হাজার পাখি মেললো দীর্ঘ সবুজ ডানা
ভগ্ন পাঁজর, ক্লান্ত নূপুর—
সুখের মুখে ছড়িয়ে দিলাম এক কুলো ছাই

ভয় কি আমার ! ভয় কি আমার ! কানীন বালক
স্বপ্ন দ্যাখে……

একত্রিশে ডিসেম্বরের কবিতা

প্রাপ্য ও প্রাপ্তির বিভেদে শব্দেরা নড়ে,
কথা বলে ; ক্রমশঃ কঠিন হয় মুঠো
পূর্ণ-শুভ্র-চাঁদ হেঁটে যায় বিপরীত দিকে,
হিম-রাত্রি জাগে একা হাঁড়িয়া নেশায়

পুরানো পোষাক ছেড়ে আড় ভাঙ্গে সাপ,
বাজারে আগুন জ্বালে ঘাটতি বাজেট

স্বপ্নদোষে ভেসে যায় তোষক, চাদর....

পয়লা জানুয়ারীর কবিতা

নিঃসাড়ে ঢেলেছে বিষ অমল শরীরে

বুকে হেঁটে চলে গ্যাছে ক্লান্ত শঙ্খচূড়

পাঁজির নিয়মে চাঁদ হেলে আছে উত্তরমুখী

রাতপাখি শুরু করে প্রণয়ের ছল

কবিরা ব্যস্ত আছে কল্পচিত্র নিয়ে....

শববাহী ফিস্‌ফাস্ শব্দের পাশে
মৃতের বিছানা টানে ডোমের ছেলেরা

ঈশিতা ভাদুরী

রূপসী মেয়ের

জিভ পুড়ে যায়
রূপসী মেয়ের।
এক পেয়ালা চা,
এত উষ্ণতা তোমার চুম্বনে?

তুমি

এই রাত সরলেও কান্না
না সরলেও তাই,
তুমি চলে যাবে আজ মধ্যরাতে।

আশা

মেঘ তোমার জন্যে
সাড়া পৃথিবী তোলপাড় করে
আমি বৃষ্টি এনেছি,
আমায় একটু ভালোবাসবে বলে।

জ্যোৎস্না রাতে

জ্যোৎস্না রাতে
নিঘুম একা বিছানাতে.....
তোমার আসার কথা ছিলো,
তুমি আস নি।

বিশ্ব সুন্দরী

বিশ্ব-সুন্দরী সেজে
তুমি দাঁড়িয়ে থেকো না,
পৃথিবীর সমস্ত লোভী পুরুষেরা
তোমাকে বিবস্ত্র করে দেবে।

কাজল চক্রবর্তী

নিষিদ্ধ জানাল ০ ৬

তোমার মধ্যে লোভ আছে উজ্জ্বল
আমার মধ্যে তারও বেশি কিছু
তোমার সঙ্গে বিরোধ করার ফলে
চিৎ হয়ে শুয়ে বুকেই পড়ছে থুতু।

নিষিদ্ধ জার্নাল ০ ১০

এক রাশ অন্ধকার আর বিষাদের মধ্যে জলে উঠছে আলো
অনেক দিনের সেই ফেলে আসা গান, এখন চার দেয়ালের মধ্যে
ঝম্‌ঝম্ সুরে বাজছে। সুন্দরকে ফিরিয়ে দিয়েছি গতকাল
সে ফিরে গেছে মাথা হেঁট করে। আমার এ রূপান্তর
তাকে দিয়েছি অসহ্য যন্ত্রণা। আমি তাঁকে ফেরাতে পারিনি
সম্পূর্ণ ব্যর্থ নগ্ন হয়ে আছি সময়ের কাছে। ভাঙা মন
ক্রমে ক্রমে টেনে ধরছে সমস্ত গতি। গুহার মুখ বন্ধ
বিরাট পাথরে। বন্দী হয়ে আছি, এখানে ক্ষিধে নেই
লালসা নেই, ক্রোধ নেই, কি আছে?
বহু চেষ্টার পরে জানা গেল "বায়ু"
আশ্চর্য নিজের কণ্ঠের স্বর নিজের কাছেই ফিরে এলো।

নিজস্ব জার্নাল ০ ১১

উঠোনের মাঝখানে গাঢ় অন্ধকার
বসে আছে স্থির।
ঘরের নিয়ন আলোয় তোমাদের সুখ
জলছে জলুক
বয়াতির আলখাল্লা খঞ্জনীর তালে
থাকো সুখে থাকো
অনেক অসুখ আছে
আমাদের বসন্তের বাগানে
গাঙের বুকের ভেতরে বদলাচ্ছে দেশ

নিজস্ব জার্নাল ০ ১৩

যুবক ঈশ্বর হয় না।
বিষধর সাপের মণি মুঠোতে ধরে রাখে
সঠিক আরোহী সমেত কাত হয়ে থাকা নৌকো ফেলে
এরা মোহন গন্তব্যে যেতে চায়
রোদে চুমো খেয়ে তরুণীর লাল নীল ঘুড়ির সুতোয়
লাট খেতে খেতে বাহারী কার্পেটের মত থাকে
সমকালীন বৈঠকখানায়
ঈশ্বরী'র এই সব যুবকেরা ঈশ্বর হয় না।

কিছু যুবকের নিজস্ব প্রুফে ডুবে থাকা মাথা
মহাপয়ারের দাঁড়ে পুষে রাখা বর্ণমালায়
ক্ষয়ে যাওয়া মানুষকে বাঁচতে শেখায়
এরা কেউ ঈশ্বর হয়না

কেননা ঈশ্বর যুবক নন।

সারা ভারতে আশির বাংলা কবিতাকে চারিয়ে দেবার জন্য দ্বিতীয় দফায় বের হচ্ছে

আশির দশকের
বাংলা কবিতার
হিন্দী অনুবাদ

(সংকলন ও অনুবাদ : **অজিত রায়**)

বোর্ড বাঁধাই, দামী উন্নত মানের কাগজে ছাপাই এই সংকলনে থাকছে এ-দশকের আটজন সেরা কবির আটটি করে কবিতা, তাঁদের পরিচয় ও ছবি।

আসুন, ভারতবর্ষ দেখে যান

নেতিয়ে থাকা নিজিব বাচ্চাটিকে, যার সরু সরু হাত পা এবং দৃশ্যত যা নেংটি ইঁদুরের মত দেখাচ্ছে দূর থেকে, মাই দিতে দিতে মেয়েটি যখন কানাডাঙা মাটির থাপরায় তরকারীর খোসা সেদ্ধ করতে-আছে, অন্যটি, যার পাঁজরের প্রতিটি হাড় দৃশ্য, এক-দুই-তিন এই প্রকারে গোনা যায়, যখন উনুনের কাছে অতিবাধ্য সন্তানের মত বসে, চোখ মুখ থাপরার দিকে একাগ্রমান, নাক বিস্ফারিত, রান্নার সুঘ্রাণ লইছে, আর পেটে সারাদিনের ক্ষুধা যা দাহসৃষ্টিকারী এবং চোখেও, নিয়ে অপেক্ষারত কখন থাপরাটি নামানো হবে, তখন, ঠিক সেই সময়, ধোপ-দুরস্ত পোষাকওলা এক ভদ্দরলোকের, যার রয়েছে জেমসবন্ডিয় এ্যাটাচিকেশ এবং রঙ বেরঙের ফুল ফুল ডোরাকাটা জামা, মংগোলীয় ধাচের গোঁফের ওপর একফোঁটা বৃষ্টি এসে পড়ল এবং লোকটি বড়বাবু-সুলভ নিরীহ ধূর্ততায় একবার আকাশের দিকে চোখ চালিয়ে নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে সেই গাড়ী বারান্দার নীচে চলে এল। এই মেয়েটি ভিখিরী, কয়েকখানা মাটির ভাঙা থাপরা একটা ন্যাকড়ার পুঁটলি এবং গোটা দুয়েক রোগাপটকা বাচ্চা নিয়ে তার সংসার, যা এখানে, এই পরিত্যক্ত গাড়ী বারান্দার নীচে এখন ইতস্তত। বাইরে জোরে জোরে কড়া নড়ে উঠতে ঘরের চার প্রাণী একসংগে চমকে ওঠে, ফুঁদিয়ে কেরোসিনের কুপিটা নিভিয়ে দিয়ে জোয়ান ছেলেটি মুহূর্তমধ্যে তক্তপোষের নীচে যেখানে ছেঁড়াকাঁথা ভাঙা টিনের বাক্স সব ডাঁই করা কোনরকমে নিজেকে ঢুকিয়ে নেয়। বাইরের দরজায় দমাদ্দম লাথি পরতে থকে, বহুদিনের পুরনো দরজাখানা থথর কাঁপে। বৃদ্ধ বাপ, যার চোখ নিষ্প্রভ ও পারস্পর্যহীন, ধীরে ধীরে উঠে দরজা খুলে ধরতেই চার-পাঁচটি ছোকরা ঢুকে পড়ে ঘরে, যার হাতে রিভলভার সে চেঁচিয়ে ওঠে : 'গৌর কোথায়—শালা শুয়োরের বাচ্ছা ?' এখন ধুলোর ঝড় আরম্ভিয়াছে, আকাশে অন্ধকার-উদ্রেককারী মেঘ জমা, বৃষ্টি

সম্ভব হয় হয়, মেয়েটির দুদিকে দুটি বাচ্চা, এখন এই বেলা-চৌপহরে তরকারীর খোসা সেদ্ধ করতে করতে চলে যাচ্ছিল সেখানে ছিল যেখানে তার সুখীগৃহকোণ একদা সে ছিল যুবতী বৌ, তার প্রিয় সবুজ রঙের শাড়িটি (যা মহার্ঘ নয় অথচ বড় আপন), হাত ভর্তি লাল নীল কাঁচের চুড়ি, সিথিতে চওড়া করে পরা সিঁদুর, বাঁ হাতে তিন-চারটি লোহা (সাধব্যের লক্ষণ), গভীর কালোচুল—সিঁথির দুপাশে ঢেউ, সেই মুহূর্তে সেই চুলের রাশ পিঠের উপর ছড়ানো, ঈষৎ ভেজা, সদ্য স্নান করে আসা.....সমবেত জনতার সামনে হোসেনালি কসরৎ দেখায়, লাফিয়ে ওঠে ম্যাজিক দেখানো মাচানের ওপর, বাতাসে তার লুংগি ওড়ে পৎ পৎ, সে তার ঝুল পিরানের এক পকেট থেকে বার করে গোটা তিনেক জাপানী পুতুল, আর-পকেট থেকে রিভলভার। পুতুল তিনটেকে পর পর টেবিলের ওপর সাজিয়ে তাদের দিকে রিভালভার তাক করে সমবেত জনতাকে হাতমুখ নেড়ে বোঝাতে সুরু করে হোসেনালি: 'এই দেখুন জনগণ, কিভাবে শত্রুকে শায়েস্তা করতে হয়' বলতে বলতে জনতার নাকের ডগায় পিস্তল নাচায় হোসেনালি, নাচাতে থাকে, তারপর এক সময় স্থির চোখে গুলি করে, পুতুলগুলোর বুক ফুটো হয়ে যায়, টপ টপ করে টাটকা রক্ত বাইরে বেড়িয়ে এলে জনতা, বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত, হাততালি দিতে থাকে, শত্রুকে শায়েস্তা করার কসরত শিখে নেয় নিবিড় চোখে। ছেলেটি মেয়েটে দৌড়ে এসে, তখনো তারা হি হি হাসি-রত, ঢুকে আসে সেই গাড়ীবারান্দায়। তাদের দুদিকে লোকজন, যারা বৃষ্টি থেকে আপন আপন বাঁচাতে আশ্রয় নিয়েছে, তাকিয়ে মেয়েটার যৌবন উঠতি বয়স হি হি হাসি সব—সবকিছু দেখতে থাকে, কিন্তু এদের তারা, সেই ছেলেটি মেয়েটি গ্রাহ্য করেনা। মেয়েটি বলে: 'বৃষ্টিতে ভিজতে কি ভালোইনা লাগে আমার, চলো না সুনু আমার ভিজি।' বলে সে ছেলেটার বুকের কাছে সার্টটা খিমচে নিয়ে মুখের কাছে চোখজোড়া তুলে ধরে। বাইরে বৃষ্টির ঝাট বাড়তে থাকে, ডুবে যেতে থাকে ট্রামলাইন, লোক বাড়তে থাকে এই স্বল্পায়তন গাড়ীবারান্দায়, যেখানে ভিখিরী এই মেয়ে, জনা-দুয়েক বাচ্চা এবং সাধের সংসারখানা। হোসেনালি এখন কাটামুণ্ডুর ম্যাজিক দেখায়, দেখাতে থাকে, ঝকঝকে এক পেতলের রেকাবির ওপর বিরাট এক কাটামুণ্ডু বসিয়ে

সমবেত জনতাকে বোঝায়: 'বাবুয়া দেখুন, প্রত্যক্ষ করুন, কাটামুণ্ডু জ্যান্ত মানুষের মত কথা বলে, প্রশ্নের উত্তর দেয়।' বলে সে জনতাটিকে কায়দামাফিক সেলাম ঠোকে, জিজ্ঞাসা করে প্রশ্নমালা—

হে কাটামুণ্ডু তুমি কি মানুষ
করুণাময় ঈশ্বরের দয়ায়
তুমি এখানে কেন
করুণাময় ঈশ্বরের ইচ্ছায় আনীত
তোমার মুণ্ডু কেন কাটা হল
জগতে সমস্ত কিছুই তো করুণাময় ঈশ্বরের ইচ্ছায়
সংসারে তোমার কে আছে—মা বাবা ভাই বোন বন্ধু
কেহ নাই এক করুণাময় ঈশ্বর ছাড়া

বৃষ্টি—তা বাড়ছে, বাড়তে-আছে, জল জমে উঠছে রাস্তায়, ভরে উঠছে গাড়ীবারান্দার স্বল্প আয়তনটুকু। ঠেসাঠেসি লোক—এখানে এখন ঝকঝকে চশমাপরা টাইবাঁধা চকচকে ফাইলবাবু, ছাতা হাতে মাথায় টাক মলিনমুখ মধ্যবয়স্ক সরকারী কেরানী, লম্বা চুল যা বাবরির মত মাথায় বিন্যস্ত লম্বা জুলফি ফিটফাট চেহারার ছোকরা, ঝাঁকা মাথায় চিনেবাদামওলা, জ্বালানো কেরোসিনের স্টোকের নীচে বিরাট থালায় উপচেওঠা ঘুগনি নিয়ে ঘুগনিওলা। ভিখিরী মেয়েটার রান্না লণ্ডভণ্ড ঘটেছে, বৃষ্টির ঝাঁটে ভিজে গেছে তার সংসার, কোন রকমে তার যথাসর্বস্ব—ন্যাকড়ার পুঁটলি খানদুয়েক ভাঙা হাড়ি চটাওঠা টিনের গেলাস আর দুখানা বাচ্চা আগলে কোণের দিকে গুটিসুটি মেরে বসে। শহরতলীর এই অঞ্চলে, এখানে, একটি শূন্য নির্জনতা, সরু এবড়ো-খেবড়ো রাস্তার একদিকে বড় বড় টিনের সেড যা কারখানাগুলোর পশ্চাৎভাগ, অন্যদিকে, খানাখন্দ আর বিস্তৃত জলাভূমি, কচুরীপানায় ভর্তি এবং তার বেগুনী সব সতেজ ফুলের শোভায়, কাঁকেসুন্দা অ্যাসসেওড়া ও বুনোকলমীর জংগল, কশ্চিৎ-কখনো ধড় ধড় শব্দে সাইকেল রিকসা যায়, লরি চলে বিকট আওয়াজ তুলে, ধুলোয় ঝড় বইয়ে, এইখানে, এই নির্জন পরিত্যক্ত জলাভূমির একপাশে, নোংরা জলকাদায় মাখামাখি হয়ে চটের বস্তায় টুকরো-টুকরোয় কাটা গৌরের লাশ—পড়ে রয়েছে যা, পচে যাচ্ছে যা। শুধু একটা হাত বস্তা ছিড়ে বাইরে বেড়িয়ে পড়া;

গলে যাওয়া সেই হাত দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ—যা পাহারা দিচ্ছে দুটো কুকুর আর গোটা-তিনেক শকুন। বৃষ্টিতে এখন শহর টৈটুম্বুর। গাড়ীবারান্দাটুকুতে ভীড় উপচে ওঠায় বাতাসের ঝাপটায় ভিজে যাচ্ছে ঠাসাঠাসি করে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষজন। 'এখানেও ভিখিরী' জনৈকের মন্তব্য। 'কলকাতা শহরটা বাসের অযোগ্য করে ফেলছে দিনের পর দিন 'তাড়িয়ে দিন না—মানুষ দাঁড়াতে পারছে না উনি এখানে ঘর-সংসার পেতে বসে আছেন।' মেয়েটি এতক্ষণে ফোঁস করে ওঠে: 'কনে যামু'? জাতে ভিখিরী কিন্তু তেজ দেখ না—লবাবের বিটি 'রাস্তা ফুটপাত সব দখল করে বসেছে যেন বাপের সম্পত্তি'; একজন সুন্দর চেহারার মহিলা, বাঁ হাতে তখনো গো গো চশমাটি ভাঁজ করা, দাঁড়ানোর জায়গা পাচ্ছেন না, বাতাসের ঝাপটায় ভিজে যাচ্ছে তাঁর লো-কাট ব্লাউজসুদ্ধ খোলামেলা পিঠ। বাবরি-চুল লম্বা-জুলফির ছেলেটি এগিয়ে এল ভিখিরী মেয়েটির দিকে 'এ্যাই মাগি-ওঠ এখান থেকে, ভদ্রমহিলাকে দাঁড়াতে জায়গা দে' 'কনে যামু' 'টেনে বার করে দিন মশাই—সোজা কথা শোনার পাত্র নয় এরা'....গৌরের, সেই টুকরো টুকরো করে কাটা হাত পা মাথা ধড়, বস্তায় ঠাসা, নির্জন এক জলাভূমির প্রান্তে পচে যাচ্ছে, পাহারা দিচ্ছে দুটো কুকুর আর গোটাতিনেক শকুন। পচে যাচ্ছে সেই শরীর—সেই মুষ্টিবদ্ধ হাত, পচে ক্রমশ বিষিয়ে দিচ্ছে আবহাওয়া, বিষিয়ে উঠছে শহর, গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে বাতাসে। টেবিলের ওপর উঠে হোসেনালি ম্যাজিক দেখাচ্ছে—বুলেট বিঁধিয়ে শত্রুকে শায়েস্তা করার ম্যাজিক, কাটামুণ্ড ম্যাজিক। মেয়েটি কোনরকমে তার জায়গা ছাড়ছে না, তবু টেনে হিঁচড়ে তাকে বার করে দেওয়া হল। এখন সে এক হাঁটু জলে, তাঁর বাঁ-কাঁখে কোলের বাচ্চা, ডান হাতের মুঠোয় অন্য ছেলেটির হাত, মাথায় ন্যাকড়ার পুঁটলি ও সংসার, বৃষ্টি হচ্ছে অজস্র ধারায়, তার ওপর তার বাচ্চার ওপর তার মাথায় রাখা সংসারের ওপর, নদীর মত জলের স্রোত বইছে, ডুবে গেছে সমস্ত দিকের রাস্তা, সে, দিকদিশাহীন এক বৃষ্টির মধ্যে, দুদিকে দুটি বাচ্চা আর মাথায় সংসার নিয়ে, তাকিয়ে আছে।

তখন

বৃষ্টিতে ধুয়ে যাচ্ছে হাঁসুয়া-হাতুড়ি-ছাপাই পোষ্টারের রঙচঙ
রেডিওতে বাজছে রবীন্দ্রঠাকুরের গান
তোমারই গেহে পালিত সেনেহে তুমি ধোন্যো ধোন্যো হে
তুহি ধন্যো ধোন্যা হে

আর

নির্জন জলার ধারে পচে যাচ্ছে গৌরের বস্তাবন্দী মৃতশরীর
চমৎকার জমে উঠেছে হোসেনালির ম্যাজিক
যা কাটামুণ্ডুর যা শত্রুকে শায়েস্তা করার ॥

[সমকালীন পরিপ্রেক্ষিত ও প্রাসঙ্গিক প্রয়োজনীয়তায় সুবিমল মিশ্রর রচনা সুনমুদ্রণ করলাম]

সম্পাদক [অ. সা.]

আমি কিভাবে অ্যালেন গীন্সবার্গকে সমর্থন করি

অজিত রায়

আবিষ্কৃত হবার আগে দীর্ঘকাল মাটির নিচে ঢাকা পড়ে থাকে কমল হীরে। জিওলজিক্যাল সার্ভের কর্মকর্তারা অনেক ঘাঁটাঘুঁটি খোঁড়াখুঁড়ি করে বের করে তাদের। অ্যালেনের ব্যাপারটা তেমন ঘোরালো নয়। প্রতিভাবান, মেধাস্পৃহ এই হীরে আমাদের জ্ঞানের আলোয় এসেছেন, তাঁর উত্তরণের যখন সবে হাতখড়ি, প্রায় তার সমসময়ে। মানে, অ্যালেনের কোনো ধারাবাহিক ইতিহাস নেই, বিবর্তনশূন্য ভূঁইফোঁড় তাঁর কবিতা, তা নয়। মানে জন্ম থেকেই তাঁর কবিতা অযোনিসম্ভবা। প্রতিভাধর শিল্পীর ক্ষেত্রেও যেটা ঘটে ক্বচিৎ। প্রায় আড়াই দশক ধরে তাঁর সঙ্গে বাঙালির আলাপচারিতা। অনেক বসন্ত দেখেছি আমরা তাঁর পাশাপাশি—বন্ধুত্বের অনাবিল মূল্যবোধে। এবং বলা বেশি, আমরা বিদ্রূপ হলও তাঁকে বিঁধেছি আমাদের সহজাত রক্তগুণে। তথাচ, লজ্জার কথা, দুঃখেরও, যে, আলোকনের কোনো চেষ্টাই বাঙালী সেরে রাখেনি। ছিটপুট যদি বা করেছেন কেউ কেউ, কিন্তু স্পোর্টিংলি নয়, ঝোল-টানটানি থেকে গ্যাছে। এমতাবকাশে, বক্ষমাণ রচনায় লজ্জা-ক্ষলনের যৎকিঞ্চিৎ প্রয়াস পাওয়া গেল।

তো, অ্যালেন গিন্সবার্গ-জীবনী লিখবো কি? আমেরিকার কোন্ অঙ্গরাজ্যে কোন্ মোহল্লায় তাঁর জন্ম। মা-বাবার নাম অমুক-তমুক বা গত ৩ জুন ওঁর বয়স ৬০ বছর কমপ্লিট হলো, ছোট্টবেলায় হেভি পাজি ছিলেন আর একবার চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে ধোলাই খেয়েছিলেন কি মেন্টাল হসপিটালের বেডে লাট খেয়ে পড়েছিলেন মগজের চিকিৎসার জন্যে—এসব জানাবেন সুকুমার বাবুদের অনুক্রমীরা; আমি তো ব্যস, ভালো লাগার না লাগার ফ্যাদলামিটুকু ঝাড়তে পারি। স্রেফ জানি, কবি মাত্রেই খ্যাপা। যে যতো বড়ো খ্যাপা সে ততো উঁচু থেপের পোয়েট। আর মার্কিনী খ্যাপাদের সূচি শুরু হয়েছে সম্ভবত অ্যালেন গিন্সবার্গেরই নাম দিয়ে। কী খ্যাপামিতে কী কবিত্বে—তাঁর অমোঘতা পরম নিন্দুকেও নাকতোলা করতে পারে না।

বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন একশো জনকে। আমি বলি, একশো নয়, পঞ্চাশ নয়, পাঁচজন অন্তত অ্যালেন গিন্সবার্গ আমাকে দাও আমি মানুষমারাদের রাইফেলের কাতু জে সুরাখ পয়দা করে দেখিয়ে দেবো। রাজনৈতিক চেতনাকে কবিতায় রূপ দেবো কিভাবে বা কতখনি? অ্যালেনের সাফ কথা: 'রাজনীতির কর্কশা ছবির মধ্যে কোথাও—না—কোথাও তার একটা মুদ্রা এমন আছেই, যেখান থেকে স্রেফ কবিতা, কবিতা আর কবিতাই জন্মাতে পারে।' এই চেতনা থেকেই তিনি, মার্কিন গবর্ণমেণ্টের বিখ্যাত কাস্টম বিল্ডিং-এর বলতে-গ্যালে পাশেই অবস্থিত ইন্সটিটিউট ফর পলিশি স্টাডিজ-এর সভাগারে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে কবিতা বলেন—

'স্বর্গ যদি হয় তবে ঠিক এইরকম
উচ্চ-আদালতে না থাকবে বুদ্ধ
না রিপাবলিক্যান, না ডেমোক্র্যাট.... '

গত কয়েক বছর ধরে অ্যালেন গিন্সবার্গ হোয়াইট হাউসকে নিজের কবিতা-রাইফেলের টার্গেট করেছেন। সেই হোয়াইট হাউস যেখানে রয়েছে সি আই-এ-র বাজেট, জার্মান মাথাব্যথা, সৈন্যদের লুকনো দূরভাষী যন্ত্র আর এফ বি. আই-এর ছারপোকা। যাট পেরোলেন গিন্সবার্গ, কিন্তু, মাইরি, তাঁর কথ্য এ-ওব্দি যেন গরম খুনওলা জওয়ানের। বিতর্কের ঝড়—সামন্ত-ব্যবস্থা থেকে বুদ্ধইজম ওব্দি গড়িয়ে, ফের মাও-এর দূরদর্শিতা—কী নেই সেখানে! ব্যস্, রোমান্টি-সিজমে যেমন কীট্স তাঁর কাছে তেমন পঠনীয় রয়েছেন একজনই। তিনি, বীটবংশের এক নম্বর কবি, জ্যাক কেরুয়াক (জন্ম ১৯২২)।

মার্কিন দেশের যীশু অ্যালেন গিন্সবার্গ। বুদ্ধের আবির্ভাবের মতোই আশ্চর্য কবিতাক্ষেত্রে তাঁর আগমন। আশ্চর্য, কেননা তিনি জন্মেছেন—তৃতীয় বিশ্বের কোনো খোঁড়া দেশে নয়—আমেরিকায়। অ্যারিস্টটল থেকে এ-ওব্দি 'কাব্যাত্মক ন্যায়' নিয়ে বড়ফড়াঙ্গি চলে আসছে। কেউ কি ভেবেছেন কবিতা-ব্যাপারে একটা 'অন্যায়ও' দগ্‌দগ করে পাশাপাশি—? যা খদ্দরী প্রজাতন্ত্র থাকি মিলিটারিতন্ত্র আর শাদা কম্যুনিজম-ব্যবস্থায় অত্যন্ত অবজ্ঞিত ও তিরস্কৃত ধ্বনি হিসেবে পরিভাষিত। আর সেখানেই, ওয়াশিংটনের কথাই বলা হচ্ছে, কবিতা

নয়—রয়েছে স্রেফ একটা বেনিয়া কনশেপশন, যা বিশ্ব-রাজনীতিকে জমা-খরচের নিক্তিতে ওজন করে। সম্ভবত এই কারণেই আমেরিকা ভালো কবিকে জন্ম দিয়েছে খুব কম। ওয়ালেস ষ্টিউইংসের দেহরক্ষার পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর লেখন জগতে একা গিন্সবার্গই সেই বিরল অস্তিত্ব, 'হাউল'-এর সূত্রে বারংবার উচ্চারিত যার নাম।

রুশ নীতি বলছে, সাধারণ মানুষকে কিছুই জানাতে হবে না। ওয়াশিংটনের ধ্যেয় হলো, সাধারণ মানুষকে এতো-কিছু জানিয়ে দাও যাতে তাদের বিবেক বুদ্ধি জবাব দিয়ে বসে, সে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ুক। না-জানানো আর বেশি জানানোর পেছনে একটাই উদ্দেশ্য যে, জনতার মগজ থেকে সত্তা আর সত্তাধারীদের চিন্তা লোপাট হয়ে যাক। পার্থিব বা ছোটো ছোটো সুখের খোঁজে তাঁরা দূরদর্শনের পর্দায় সরকারি ইস্তেহার শুনুক, ইউনাইটেড ডেন্টা, ইউ. এস. এয়ার, ইস্টার্ণ, নিউইয়র্ক এয়ার বা ওই জাতীয় কোনো হাওয়াই-কম্পানিকে পাকড়াও করে সস্তা ভাড়ায় কোথাও ছুটি কাটাতে বা পিকনিক করতে চলে যাক। বুক-চেরা মেম নিয়ে ফুর্তি মেরে বেড়াক; কিন্তু এদিকের ব্যথা তোমার মাথায় থাকবে কেন? ....খুঁজে দেওয়া বা ঢুকে পড়া এই পিলপিলে বিষটাকে লাথিয়ে দিতে পেরেছেন অ্যালেন গিন্সবার্গ। রাশিয়াকে 'রাবণ ঘোষণা করে আমেরিকান প্রয়াসটাকে তিনি নাম দিলেন—'রেগনের থিইষ্টিক প্যারোনিয়া'।

অ্যানেল গিন্সবার্গ নামটির সঙ্গে ল্যাজে-মুড়ে আছে 'বীট' কথাটা। সুতরাং, এইখানে, প্রসঙ্গত, বীট বিটচ্যাড্ ইত্যাদি নিয়ে আমি একটি সংক্ষিপ্ত ধানাই-পানাই উপস্থিত করতে চাইবো। এবং এ-ব্যাপারে, প্রথমেই, আমাকে শ্রদ্ধেয় বুদ্ধদেব বসুর শরণ নিতে হচ্ছে—যিনি বলেছিলেন: 'ভিড়ের মধ্যে বীট-বংশকে শনাক্ত করা সহজ। মেয়েরা পরে কালো মেজো লম্বা চুল রাখে, লিপষ্টিক মাখে না; আর পুরুষেরা রাখে দড়ি আর ঘাড় বেয়ে..... নামা লম্বা চুল, তীব্রতম শীতে ছাড়া টুপি কিংবা ওভারকোট পরে না; জামা জুতো বা দেহের পরিচ্ছন্নতা-সাধন তাদের হিসেবে অনাচার।' এই বংশের আদি কবি জ্যাক কেরুয়্যাক। এখানেই অ্যালেনের, অর্থাৎ কেরুয়্যাকের পরেই যাঁর স্থান এবং যিনি এই উদ্ভূথর আন্দোলনের স্রষ্টা, তাঁর কবি—পরিচিতি, জনপ্রিয়তা, কবি চরিত্র্য—তিনটি বিষয়ে কয়েকটি উদ্ধৃতির শরণ নেওয়া যেতে পারে:

'লম্বা নন, বরং বেঁটের দিকে, ছিপছিপে শরীর, গায়ের রং হলদে-ঘেঁষা ম্লান, চোখে চশমা, নেহাৎ 'ভদ্রলোক'দের মতোই দাড়িগোঁফ কামানো, পরিষ্কার সিঁথি-কাটা চুল কিন্তু মাথা নোয়ালে ছোট্ট টাক দেখা যায়; অর্থাৎ চেহারায় শাস্ত্রসম্মত লক্ষণ একটিও নেই, যদিও পালিশহীন জুতো, ইস্ত্রিহীন প্যান্ট আর গলা-খোলা কোর্তায় গোষ্ঠী চেতনার পরিচয় আছে। —এ-ই হলেন অ্যালেন গিন্সবার্গ ...'

[বুদ্ধদেব বসু: বীটবংশ ও গ্রীনিচগ্রাম]

'একদিন খবর পাওয়া গেল, দুজন আমেরিকান কবি কলকাতায় এসেছে। ....গিয়ে দেখি, প্রায় আসবাবহীন একখানা ঘরে দুজন সাহেব এসেছে সত্যি। তাদের একজন থুপথুপ করে কাপড় কাচছে কলঘরে, অন্যজন ছুরি দিয়ে তরি-তরকারী কুটছে। পরনে আণ্ডারওয়েয়র, খালি গা।...'

[শরৎ মুখোপাধ্যায়: মার্কিন কবিগুরু অ্যালেন]

'Ginsberg hurls not only curses but everything-his own purporated memories of a confused, squalid, humilating existence in the 'underground' of American life and Culture, mock Political and sexual 'Confessions' (together with a childishly aggresive vocabulary of obscenity), literary allusions, and echos and the folk-idiom of impatience and disgust.'

[M. L. Rosenthal]

'Allen Ginsberg's Howl and other poems was originally published by City Light Books in the Fall of 1956. Subsequently seized by U. S. customs and the San Fransisco police, it was the subject of long Court trial at which a series of poets and professors Persuaded the court that the book was not obscene. Over 200,000 copies have been sold....'

[কবি পরিচিত: 'Howl and other Poems]

এ তো গেল গিন্সবার্গ পরিচিতি। কিন্তু বীট আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর নাম যতই জড়িয়ে থাকুক, অন্বেষু গবেষকরা ধরে ফেলেছেন, এ-কবি জাতে আলাদা, কোনো নির্দিষ্ট খেপের মোহর দেগে তাঁকে চালানো যায় না। অ্যালেনের শেষের দিকের, মানে সাম্প্রতিক কাব্যচর্চা দেখলে-টেখলে তো মনে হবে তিনি বীট কবি ননই—বরং আপাত বীটতন্ত্র-বিরোধী। আমরা তো দেখেছি একটা 'হুজুগ' হিসেবে হয়েছিল বীট-আন্দোলনের সূচনা। এবং লরেন্স ফেরলিং গোট্টি (জন্ম ১৯১৯) থেকে শুরু করে, জ্যাক কেরুয়্যাক (১৯২২), অ্যালেন গিন্সবার্গ (১৯২৬) এবং গ্রেগরী করসো (১৯৩০) প্রমুখ ছাড়াও হাঙ্গামার সঙ্গে জুড়ে ছিল ই. ই. কামিংস, হেনরি মিলার, কেনেথ রেকসথ, নরমান মেইলার, পল গুডম্যান প্রভৃতি নাম। এবং এই প্রসঙ্গেই উদ্ধরণ দেওয়া চলে: If beat poetry has any common denominator apart from the proclevity of its authors to make it recitable to the accompaniment of Jazz, this would consist in its exaltation of ecstatic, visionary states of emotion and appreciation.' [W. Barrenhard Flishman : Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics]. এই আন্দোলন, ষাট দশকের শুরুতে, ছড়িয়ে পড়েছিল বার্লিন, পারি, কোপেনহেগেন প্রভৃতিতে। এবং এরই একটা ঢেউ অ্যালেন ও তাঁর সগোত্ররা তুলেছিলেন বাংলা কবিতারও তটভূমিতে। সে কথা বাদে।

যেটা স্বাভাবিক, বীট-আদর্শ ও ও বীট-ধর্মের মিল কোন কোন ক্ষেত্রে নেই-ই। অ্যালেনও বুঝেছেন, হিটলার ব'নে পুরো দুনিয়াটাকে দাপানো সহজ, কিন্তু, আজ, এই বিশ শতকে আচমন-করা প্রতীচীতে 'রিভোল্ট করে সফল হবার দিন নেই। তাই, বীট পোয়েট্রি বলতেই যে দুরন্ত বেলাগাম গতির কথা মনে পরে, যিনি বীট আন্দোলনকে এইভাবে পরিচিত করেছেন এবং হাঙ্গামাকে চূড়ান্ত পর্যায় পৌছে দিয়েছিলেন—সেই অ্যালেনের, দুরন্ত প্রবহমান জীবনস্রোতের মধ্যবর্তী বিন্দুতে দণ্ডায়মান থেকেও, শেষ ওব্দি মনে হয়েছে :

'....all movement stops
and I walk in the timeless sadness of existence,
tenderness flowing thru the buildings'
my fingertips touching reality's face...

[My Sad Slef]

এটা কি বিষয়তার পরিচায়ক নয়? কিংবা—

'I take the elevator and go
down, pondering,
and walk on the pavements starting into all men's
plateglass, faces,
questioning after who loves. (do)

বিদ্রোহ করেছিলেন অ্যালেন, কিন্তু সেই বিদ্রোহ তাঁকে 'প্রতিষ্ঠিত করে ফসল। আর একবার প্রতিষ্ঠিত হয়ে পড়লে কোনোদিন-আর প্রতিষ্ঠানের গেলাপে 'বিদ্রোহ করা' সম্ভব নয়। লাখ লাখ কপি বিক্রি হচ্ছে 'হাউলের' আড়াইশোর বেশি ডলার পকেটে ঢুকছে তার ফি মাসে, এখনও তাকে 'বিদ্রোহী' বলতে হবে? তথাচ তিনি আমাদের প্রণম্য। তাঁর অনন্য মানব - কবিতার কারণে। এই সেই কবি যিনি শোনাতে পারেন —

'I saw the best minds of my generation destroyed
by madness, starving hysterical naked
[Howl]

A bitter cold winter night
Conspirators at cafe tables
discussing mystic jails [Planet News]

'under the bluffs of Oroville, blue cloud September
skies entering
U. S. border, redred apples bend their tree
boughs propt with sticks (The Fall of America)

হিরোসিমা -নাগাসাকিতে অ্যাটম বোমা হাবড়ানো হলে অ্যালেন কি গান্ধীর ভূমিকায় মজেছিলেন? আমরা তো জানি, ছেচল্লিশের অগাস্টে মুসলিম লীগের ঘোষিত 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসে' কলকাতা, নোয়াখালি বিহার আর পাঞ্জাবে দাঙ্গা বাধলে, খুন জখম ধর্ষণ লুঠ রুখতে মহাদরদী গান্ধীই সর্বত্র ছুটে গিয়ে ডেকে ডেকে বলেছিলেন, 'হিন্দু মুসলমান ভাই ভাই, ভ্রাতৃহত্যা বন্ধ করো।' দ্বিতীয় মহাসমরে মার্কিন জাতটাকে শোধরাতে

অ্যালেন পথে পথে তেমনে লেকচার ঝেড়ে বেড়িয়েছিলেন নাকি? না যদ্দুর শুনেছি, তিনি তখন থেকেই 'হোলিম্যান'। জানি, কথা উঠবে, মার্কিন দেশে 'হোলিম্যান' হওয়াটা এমন কি শক্ত! তামাম শক্তির কলপূর্জা তো ওদেরই হাতে। এখন ওরা সমস্ত 'পাওয়া' আর 'ভোগে'র যথেচ্চাচার থেকে রেহাই খুঁজতে—বিবেকের খবরদারিতে 'শান্তি' পেতে ওরা আধ্যাত্মিক ঠাঁই খুঁজবেই। কিন্তু না, অ্যালেন ওদের দলে নন। 'রিয়ালিটি স্যাণ্ডউইচেস' (১৯৬৩) থেকে শুরু করে হারপার অ্যাণ্ড রো প্রকাশিত তাঁর '৪৭ থেকে ৮০ সাল ওব্দি লেখা সমস্ত কবিতার সংগ্রহ, তাঁর জার্নাল, চিঠিপত্র আর ক্যাসেটবন্দী মুখনিঃসৃত যাবতীয় রচনা অধ্যয়ন করলে দেখা যাবে শাস্ত্রীয় সভাগারে তাঁর মতো ব্রাত্যজন ভূ-মণ্ডলে জন্মেছেন খুব কমই।

বুদ্ধ, চৈতন্য আর রামকেষ্টর ভারতভূমিতে বাষট্টি সালে অ্যালেন, তার বন্ধু পিটার অরল ভস্কিকে সঙ্গে নিয়ে, 'ঈশ্বর' খুঁজতে আসেননি। অধিকন্তু, এই ভাঙ্গা দেশের মুরঝে-পড়া মানুষগুলোকে একটু চনমনিয়ে দেবার ঘোর সদিচ্ছা নিমতলা শ্মশানঘাট, খালাসিটোলা আর কাশির পথে মাঠে ঘাটে ঘুরিয়ে মেরেছে তাঁকে। একটা কিছু গড়ে-তোলার ছটফটানি তাঁকে তিষ্টোতে দেয়নি একদণ্ডও। মানুষের জীবনটা দিশা না পেয়ে পুরো ভগ্নস্তূপে বদলে যাওয়ার আগেই তিনি সেটা চাইছিলেন। এটাও জানা দরকার, যে, অ্যালেন বা বীট মানেই 'তছনছ' 'ডিস্টার্ব' 'ডেষ্ট্রয়' বা 'নিছক যৌনতা' নয়। কেননা তিনি জানাতন কামশাস্ত্র-কোকশাস্ত্রের অনেকগুলো সংস্করণ ইতিমধ্যে জলবাতাস পেয়ে গ্যাছে আর 'লেডি চ্যাটার্লিজ লাভার' 'ফানি হিল' 'লোলিটা' 'টপিক অব ক্যানসার'ও বেরিয়ে গ্যাছে। আসলে, অ্যালেন সম্পূর্ণ ভিন্ন ঝড় বইয়ে দিতে চেয়েছিলেন—হাউল-এর সংস্করণের পর সংস্করণ হাজার হাজার কপি বিক্রি তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ঠিক এই অ্যালেনের জন্য, পুরো ইঙ্গিয়া না হোক, বাঙালি একরকম তৈরিই ছিল, তাঁর স্বাগতের জন্য। এহো বাহ্য। অ্যালেনের ভারত আগমনের আগেই লেখা হয়ে গেছিল— 'কিছু একটা হোক, সেই তিনটা থেকে ঠায় বসে আছি' গোছের কাব্যপংক্তি।

প্রবীণ গবেষকরা মনে রেখেছেন অবশ্যই, গিন্সবার্গের তোলা একটি ফোটোগ্রাফ ব্লক করে ছেপে কৃত্তিবাস-গোষ্ঠি তাদের কাগজের একটি বাই-

প্রোডাক্ট সংখ্যা বের করেছিল। ১৯৬৩র মার্চে। ছবিটা অ্যালেনের শুধু হাত নয়, চোখ নয় মাত্র, মনেরও যুৎসই ছাপ ফুটিয়েছিল। দোমড়ানো জীর্ণ একটি ফ্রকপরা মেয়ের—যাকে নিয়ে জঘন্য ব্যবসা চালানো হচ্ছে—আধশোয়া আধন্যাংটো ছবি। কভারে বোল্ড হরফে 'কৃত্তিবাস' এর এমত ঘোষণা, অংশত অতিরঞ্জিত কিন্তু বিলকুল বেখাপ্পা হয়নি, যে, তীব্র, উদাসীন, উন্মত্ত, ধীমান, ক্রুদ্ধ, সম্ভ্রান্ত, ক্ষুধার্ত, শান্ত, বীটনিক, ভয়ঙ্কর, মগ্ন, চতুর, সৎ, ভূতগ্রস্ত, ধার্মিক ও অতৃপ্ত কবিদের ব্যক্তিগত রচনা, কবিতা ও বিস্ফোরণ। বেখাপ্পা না হওয়ার মোদ্দা কারণ, এই সংকলনেই প্রথম, কৃত্তিবাসের লেখক কবিরা পয়লা-চান্স, যাকে বলে, মুখ খুললেন। যেন, লণ্ডভণ্ড করতে নেমেছেন সব। অন্তত, সংকলনটিতে অ্যালেনের দুটি কবিতা আর জার্নালের বাংলা তর্জমা ছেপে তাঁরা নিজেদের ট্রিগার খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। যদিচ, কৃত্তিবাসের স্তন্যপান করে আজ যাঁরা 'বড়ো' হয়েছেন তাঁরা শুধু বাজার আর সরকারের কাছে হাত পেতে পেতে এই বিশ-বাইশ বছরে, চতুরালি ও জনপ্রিয়তার ব্যাপারেই 'বড়ো' হননি, উপরন্তু, তাদের ইদানীন্তন লেখচর্চায় লণ্ডভণ্ডামির সলতে-মাত্র আভাস আর অবশিষ্ট নেই।

তবে, বাঙালি যে বিদ্রোহ বিমুখ সেটা সেপাই বিদ্রোহের দিনেই ফাঁস হয়ে গ্যাছে, কিন্তু এমনই মাটির গুণ এ-বঙ্গের, যে, বিদ্রোহের প্রথম চারাটা এখানেই গজিয়েছে। বুদ্ধিধর পাঠক সম্ভবত আমার ইঙ্গিতটা কষে ফেলেছেন। কিন্তু মাইরি, হাংরি হাঙ্গামার অন্যতম উচ্চারণ 'ক্ষুধার্ত' কথাটা শরৎ মুখুজ্জে রটিয়ে বেড়াচ্ছেন 'কৃত্তিবাসের উদগমনা' বলে, — ডাহা মিথ্যে কথা। বাজে কথার রাজা শরৎবাবু এটা বলে ক্ষণিকের জন্যেও কি ভাবলেন না, যে, বাংলা কবিতা আন্দোলনের সজাগ প্রহরী-গবেষকরা অনেক আগেই টের পেয়ে গ্যাছেন যে, পঞ্চাশের আগরবাতি ও গঙ্গাজল সাহিত্যের লেখকরা ষাটের ক্ষুধিত প্রজন্মের আন্দোলনের টেটুয়া দাবিয়ে দিতেই যুথবদ্ধ হামলা চালিয়েছিলেন হাংরি কবি-লেখকদের ওপর?? বস্তুত, অ্যালেন গাঙ্গী না হোক, একটা তরতাজা তরুণ লেখকদলকে উদ্বোধিত, প্ররোচিত ও অগ্রসারিত করতে পেরেছিলেন — এবং সে-দলটি, বলা বেশি, হাংরি গোষ্ঠী।

অবশ্যি, অ্যালেন ক্ষুধার্ত আন্দোলনকে ইন্ধন জোগালেও, সেণ্ট পারসেণ্ট প্রভাবিত করতে পারেননি—সেটা জানিয়ে রাখা ভালো। পবিত্র মুখুজ্জে প্রমুখ মলয় রায় চৌধুরীর লেখায় অ্যালেনের ছাপ লক্ষ করেছেন; এবং আশ্চর্যের, তত্ত্ববিশ্বের দিক দিয়ে কেউ কেউ যখন হাংরি রচনায় নকশালপন্থার দার্শনিকতা লক্ষ্য করছেন তক্ষুনি দেবী রায় শৈলেশ্বর ঘোষ সুবো আচার্য সুবিমল বসাক বাসুদেব দাশগুপ্ত সুভাষ ঘোষ প্রমুখের রচনায়ও বীট বা অ্যালেন প্রভাব দেখছেন, অথচ এদের কারুর সঙ্গেই কেরুয়াক, অ্যালেন বা পিটারের পরিচয় নেই। আসলে, ঠিকই বলেছেন মলয়—'বীটদের লেখালেখি না পড়ার জন্যেই বোধহয় এই অজ্ঞান তুলনা। হাংরি বিদ্রোহে যে বিটনিকদের প্রভাব তা পোর্টল্যাণ্ড স্টেট কলেজের ইংরাজি অধ্যাপক ডি এস ক্লিন বলেছেন এইভাবে: Their (Hungry's) originality is in no doubt. Compare imagery. And length of line (as translations, the music can't be heart, but lion length is some indication of its nature).

আমি প্রসঙ্গান্তর হইনি। নস্টালজিয়া বশে হাংরি-অনুষঙ্গ আলোচনায় কিঞ্চিৎ হ্রস্ব হলেও এসে গেল। এবার এখানি আমি সমর্থনের প্রশ্নটা খাড়া করতে পারি। দু দশক আগে অ্যালেন যখন কলকাতা, পাটনা বা চাইবাসায় আসেন তখন তাঁর দুর্নাম রটেছিল, সেই বছর অর্থাৎ বাষট্টিতে আমার জন্ম কিন্তু বুকে হাত রেখে বলছি, সেদিন আমি চব্বিশ বছরের থাকলে এবং মনের গড়নটা আজ যা, তাই থাকলে আমি অন্য কিছু করতুম। অন্যকিছু মানে, মলয় টলয় বনে যেতুম কি? জানি না। ..... *

কিছু কবি/কিছু কবিতা

শঙ্করনাথ চক্রবর্তীর তিনটি কবিতা—

ডমিনো খেলার রীতিপদ্ধতি ঃ ১২০

যদি সাফো'র মত লিখতে পারতাম.... আর তাই এক কুৎসিৎদর্শন কোন তরুণের চোখে, তক্ষশীলা যার কৈশোরে ছিলো না, যে মাত্র কবি যশোঃপ্রার্থী—কী ক'রে সহ্য করো তুমি। নির্বাক তাকিয়ে থাকো! তোমার মস্তিষ্কের ভেতর জটায়ুর ঘূর্ণ্যমান ডানা—ক্রমশ এগিয়ে আসে; আত্মহননের ছুরি তুলে নেয়। আর আমি সঙ্গে নিয়ে যাই শৈশবে ছাথা কোন প্রতিমার চন্দ্রাতপ, কোন নির্জন দ্বীপের ঈশ্বরীকে।

ডমিনো খেলার রীতিপদ্ধতি ঃ ১২১

তোমার আয়ুধের সংখ্যা ক্রমশ ক'মে আসবার মুখেই আমার অন্তর্ধান। যদিও চতুর সেইসবশহুরে ফাঁদের মধ্যে আমারও অস্তর্জলী নির্দিষ্ট হ'য়ে আছ। এ অধিকার কে আমাকে দিলো, শয়তান ছাড়া। আর আমি তাতেই অভ্যস্ত, অন্য সব বন্ধুত্বের টানকে অগ্রাহ্য ক'রে ক্রমেই নির্জন হ'য়ে উঠতে চাই। কখনোবা কোন মানুষের জন্যই সে নির্জনতায় ঋণ শিকার করতে চাই না। শুধু তোমার শিবিকার অপেক্ষায় থেকে আমার সন্ধ্যে কাটে, রাত ঘনিয়ে ওঠে, চোখ ভারী হ'য়ে আসে তক্ষকের ভারে; কাউকে না চেয়ে এই গর্ভবাস আমৃত্যু অর্জিত হোক আমার, শুধু তোমার জন্য আমার পর্দার সুতো খুলে আসবে, ধীরে, বিরলবাক, অনেক অশ্রুর আভাসে, একদিন মৃত ও দৌবারিক প'ড়ে থাকবে মানুষটিরই পাশে।

ডমিনো খেলার রীতিপদ্ধতি ঃ ১২২

আমার এই ঘরে আতিথ্যের সুযোগ নেয় কেউ-কেউ। তাই কাঠিন্য ও মিথ্যাচারে ভ'রে ওঠে চুনের আস্তর। আমি চাই না তোমার অলৌকিক

অন্ধকারের ভেতর বিজাতীয় কেউ এসে সোর তুলুক, হাত-পা ছড়াক, কুড়ি হাজার বছর আগেকার কথা টেনে ন্যক্কারের বয়নশিল্প হ'য়ে উঠুক। কালকর্ণীর উদ্দেশ্যে থুতু ছেটাই—যা, একা থাকতে দে আমাকে .... তুমি শ্রী, ব্যতিক্রম, ঝিনুকের রঙ্গপ্রাবী আলো, পাহাড়ের দেশে একমাত্র তোমারই জন্য প্রস্তুত থাকবো, অবসরের যে-কোন সময়

শুভব্রত চক্রবর্তীর তিনটি কবিতা

ব্যক্তিগত গৃহযুদ্ধ ১০

বিষণ্ণ ঋতুর ভয় আমি পালিয়ে এসেছিলাম হসপিটালের শঙ্খচুর
বাড়িটায়। আমি ছিলাম চিররুগ্ন; কতদিন শান্তির দূতীরা আমাকে
নিজের হাতে খাইয়ে দিয়েছে ফলের সুগন্ধী রস। পাত্রের নিচে
ঘন মধুরক্তিম মেঘ; আঙুলের কাচ স্বচ্ছ মুগ্ধতা এস্ত ছুঁয়ে ফেলে
দীর্ঘ ব্যথার চিবুক। আর তাই রাত্রির ঝাপসা ফেনায় প্রিয়
হৃদপিণ্ড পতনের শব্দ বড় বেশী কর্কশ শোনায়।

ব্যক্তিগত গৃহযুদ্ধ ১১

শুদ্ধ কবিতাগুলো নির্মিত হয়ে থাকে। কোথাও—না– কোথাও।
এখন নিজের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গড়ে তুলি ঋত দর্পন। আমি
অনায়াসে স্পর্শ করি অন্তরশীলা, নারীর পবিত্র কঙ্কাল, মেঘের
মধুরঙ টিলায়। একা বনপ্রান্তে বসি। মাঘের তুষার পাতের মধ্যে
ঝরে গ্যাছে সমস্ত শীতের পাতা। কবিত একটানা কোথাও
থাকে না বেশিদিন। কালো বর্ষাতি গায়ে ভারি জুতোর পদক্ষেপে
সে চলে গেলে আমি খুঁজে দেখি একটুকরো আগুন আছে কিনা।

ব্যক্তিগত গৃহযুদ্ধ ১২

বিষাদের নগ্ন ছায়া থেকে আমাকে তুলে এনেছিল চিলেকোঠার
নির্জন ঘরে; রাত্রির উপনিবেশ গড়ে তুলতে সিক্ত বিছানায়।
চরাচরে কোলাহল। তুমি মর্মকামী হরিনীর মতন আড়াল করো

ব্যাভিচারের আগুন, চাহনিতে গোপন শুশ্রূষা। আমার শরীর ছিলো
অচল তবু স্বপ্নদোষে চলচ্ছক্তিহীন এই পা ঢুকে যায় শ্বেতউরুর
লতাগুল্মজালে। আকণ্ঠ বিসতৃষ্ণা। সম্মুখে ছাদের কার্ণিশে
ঘন-মেঘ সন্ধা নামলে আমাকে নক্ষত্রের রক্তকাম তরঙ্গ
খুঁজে খুঁজে পৌছে দাও উত্তপ্ত কমলার ক্ষেতে।

সংযম পালের দুটি কবিতা

আকাশ রঙের রসে

আকাশের নীল নদী আমার চোখের সামনে অপরূপ হ'তে হ'তে এক
দুধের ধবল নদী হ'য়ে যায়, অপরূপ, অকলঙ্ক, মেঘ
নীচের দিগন্ত থেকে উঠে গিয়ে ভ'রে ছায় এমন সম্পদ।

বর্ষার বিকেল, ঘন সবুজের গালিচাকে কেউ টেনে নিয়েছে ধরায়,
আর বাতাস আপন আনে, জর-গায়ে পাড়ার কিশোরী
আয়নাতে চুল বাঁধে, তার চোখ মাঝে মাঝে আকাশে উদাস।

আমারও এমন জন্ম বারবার সাধ হয়, এমন পশুর
মতোন নিশ্চিন্ত মন, শুধু এক রূপতৃষা, শুধু এক বোধ
আকাশের নীল নদী ভ'রে নেবে আঁখিপটে জনম জনম।

কে আজ এমন ক'রে এই কালো পৃথিবীতে, অমাবস্যাকালে
আকাশ রঙের রসে ভ'রে দিলো? স্তূপীকৃত মেঘ
আমাকে ডাকছে তার পায়ের আহবে, আমি আউলিয়া যাবো।

আমিষ

তোমার কোলের কাছে শুয়ে আজ গন্ধ পাই আমিষ আমিষ।
রাত্রির রক্তের গন্ধ? কিংবা ভোজ যষ্ঠীদেবীদের,
তোমার মাংসের জন্য এসে আজ দেবে যারা নতুন মাংসের

জন্মের প্রথম স্বাদ? তোমার যে গন্ধ ওঠে আমিষ আমিষ,
চাঁদ তাকে বুঝে নেয়, মেঘলা আকাশ, আর অঝোর বর্ষণ
আমাকে বলেছে সেই গন্ধের ভেতরে আছে প্রথম হর্ষের

আদিম মত্ততা। তারা বলেছে প্রথম সেই মানুষীর কথা
আমিষ পাগল ক'রে যে পেরেছে টেনে নিতে উদাস মানুষ
নিজের রক্তের মধ্যে। তারা এও বলে, আজ নাকি আমি

তোমার রন্ধনে গিয়ে জীবন না দেখি যদি, পাপ হবে খুব।
দেবীদের উৎসাহে তোমার গর্ভের খোলে যদিনা নবীন
মাংসকে আনি আমি, পাপ হবে, অমানুষ, অক্ষম পাথর।

অমলেন্দু বিশ্বাসের দুটি কবিতা

অগ্নিকুণ্ড

অগ্নিকুণ্ড জেলে রাখো। যেন কখনো না নিভে যেতে পারে।
একেবারে নিভে যাওয়া নয়; সাময়িক যদি নিভে যায়
তাহলে হাতের কাছে দেশলাই রাখা সমীচীন বলে
মনে হয়। দেখো বারুদের তাপটুকু যেনো হিম এসে
শুষে নিয়ে একেবারে শব হয়ে শ্মশানে না যায়।
কেননা সময় আসেনি এখনো তার। যতক্ষণ বহ্নিশিখা
আছে, ততক্ষণ ওই হোমে ঢালো যজ্ঞ-পাতার ঘি।

অগ্নিকুণ্ড জেলে রাখো। বিরহকে দাহ করলে ভালোবাসা কী থাকে!
হয়ত তখনো প্রয়োজন আছে প্রজ্জ্বলিত হোমানলে
ঘি ঢেলে জাগিয়ে রাখা। দেখো, কখনো না বরফের স্পর্শ কাছে আসে।

স্নায়বিক

তোমার শরীর জুড়ে ম ম করে বাতাবী ফুলের ঘ্রাণ
ত্রস্ত পায়ে উড়ে উড়ে আসে লম্বা ঢ্যাঙা কবিটির দিকে।

স্নায়ুর ভেতরে, রক্তে, বিপুর ভেতরে কার নীল বান?
চন্দ্রবোড়া ঘোরে ফেরে, দংশনের রোষে বিষে, দেহ ফিকে—
হতে থাকে নিমগ্ন আশ্লেষে। অবশেষে টুপ ঘুম নেমে আসে
ভেতরে বাহিরে। কেউ কী ডাকল—'অমল—অমল' বলে? ঘাসে

দেখি শিশিরের জলজলে নাচ। চুপচাপ বসে থাকা
ঠিক নয় বলে, হেঁটে গেছি ইজেলের কাছে, দেখি সব আছে আঁকা।

অবাক শর্বরী। তুমি বেঁচে আছো নিরীহ আত্মার নাভিমূলে!
এখনো ঝরোকা বন্ধ? আরে খোলো খোলো, হাট করে রেখো খুলে।

নারায়ণ বৈরাগ্য

পূর্ণগমন

লাল পলাশের সাথে উড়ে গেছি যখন বাতাসে
মেঘেরা আমায় তুলে নিলো প্রখর আকাশে
নিচে মৌ-বন টগর বিথীর কাছে কিভাবে বলি
এ সংবাদ বলিনি, কিভাবে এখন যাবে দুরাভাষ
আমি তক্ষক, জল-বিন্দুর প্রতি অনু আঁশে আঁশে

অপার সৌরতাপ থেকে সারা শরীরে মুগ্ধ হাওয়া
তবু সারাদিন সারারাত যখন বিন্দু বিন্দু শ্রাবন, অলি
তোমার ঠোঁট, বাহু, বুক, গাল, গড়িয়ে পড়ে যখন
জল তুমি তখন জানো না, জানবেও না কোন দিবস ক্ষণ
কতদিন নীল করেছি আমি তোমার অংশত মৃদুপাশ।

আজ পূর্ণ গমন হ'তে পারে, হবে উল্কসন্নিকাশ
ভ'রে বিন্দু বিন্দু পাত, ঘন নীল বিন্দুর হবে ও ভুবনে যাওয়া।

পঙ্কজ মণ্ডল

আমার নায়িকা

সে চায়, আমি নয়
অথচ দু'জনেরই নদী এক মোহনায়
আসেনি, তবে আসবেই।

আমি কথা বলি
এমন উদাসীন চোখ আর দেখিনি
ওর মণিতারায় যে পুরুষ

সে নির্বাক,
এই শিরায় যে হুড়ি সে কার ধ্বনি নিয়ে?
তার গান—
আমি ডুব দিই স্বরযন্ত্র বেয়ে ফুসফুসে,

আর সে এখনো দু'বেলা সারেগামা সাধে।

রণজিৎ হালদার

ভুলের সঙ্গমে জন্মেছি

আমি শুই, মাথা রেখে, বালিশে নয়,
দর্জির কুঁচো-কাঁচা, কাটা কাপড়ের করুণ বোচকায়।
সিঁথানে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকে সাপ,
সাপ নয়, জীবন-মৃত্যুর ঘন অন্ধকার।
পাতের গোড়ায় ঘুরে যায় গর্ভবতী বিড়াল,
কতদিন যে মাছের কাঁটা দেখেনা ঐ পুষি
মিউ-মিউ ডেকে ইল্-বিল্ ঘুরিয়ে যায় ল্যাজ।
তুই কি জানিস্ না রে পুষি, আমি—আমার
বাবা-মায়ের ভুলের সঙ্গমে জন্মেছি এমনই—
কুসন্তান।
মায়ের গর্ভকে সবাই বলত এ যুগের বোমা ভর্তি—
পলিথিনের ব্যাগ্।

আমার খিদে থেকে উগ্‌রে দিতে পারি বারুদ,
এ আমার মায়ের আশীর্বাদ; মুদির দোকানে—
কোমর ধরে পড়ে আছে ঈশ্বর ভক্ত বাপ্।

অতনু সেনগুপ্ত

কথা/০৮

সরে দাঁড়ানো অতো সহজ ভেবেছো
কুয়াশা দ্বীপের বাসিন্দা
ক্লান্ত অবয়ব কেঁপে উঠেছিল একদিন
সে অপূর্ব আবির্ভাবে,
মনে পড়ে?
আদিগন্ত ক্যান্‌ভাসে তখন শুধু
ম্যাজেন্টা ফুলঝুরি
এ্যাতোদিন বাদে স্পর্শ পেলে তুমি
সে ধারাবাহিক পাখর, নিষ্প্রাণ
হেসেছিল সেইক্ষণে সুচতুর কোন্, শুনেছিলে.....

একাকী দ্বীপের মানুষ, তুমি আজ
সরে দাঁড়াবে মনস্থ করেছো—

স্বপন রায়

বহুতা

এত বৃষ্টিতে কে যাবে কোথায়
তুমি চেয়েছিলে নদীর প্রান্তে
আমার ভিতরে কাঁপে প্রবণতা
চলে যায় ঋতু তোমায় জানতে

এ যুবক শুধু জানেনা সহসা
মেঘ নেমেছিল বনে উপবনে
ভূমি পুড়ে ছাই অগ্নিবরণা
ভীরু গর্জনে নদীও বইছে ॥

মণীশ সিংহরায়

দুপাতা ইংরাজী জানা মেয়ে

দুপাতা ইংরাজী জানা মেয়ে আমাকে অর্বাচীন ভেবে
ঝরা পাতার শব্দের মতো প্রবল হেসেছে নব্য বঙ্গদেশে।
আমার তো আবার খুবই অনুভূতিপ্রবণ মন, প্রাচীনা
মাকে ভালোবাসি, ঝুমুর সঙ্গীত গেয়ে কেঁদে ফেলি শেষে,
মাঝরাতে পরী ভর করে। আমি বলি—
ও পরী, ও পরী তুমি কি বিদেশী ভাষা জানো না কি?
আমি তো নারকেল নাড়ুর ভাষা ছাড়া এখনও কিছুই জানি না।
আমাকে শেখাও তুমি ককটেল ভাষা, ছদ্মবেশে
ওর ঠোঁটে চুম্বন করে শেখাব আমি ভারতীয় সহনশীলতা,
যাতে তার ঝরা পাতার শব্দের মতো হাসিতে,
প্রাণসব রব করে ওঠে।

অমিতেশ মাইতি

যতোদূর শিকড় নেমেছে

আড়াল তুলে দেখি এঁকে গেছ নিষ্ঠুর ছবি, তীব্র
রঙের দহনে পুড়ছে ক্যানভাস, তবু কি অসীম শূন্যতা!
যেখানেই রেখেছ হাত দুর্দান্ত রঙের তুলি চুইয়ে পড়েছে
স্বপ্ন, পাগলা বাইসন খেপে গেছে অন্তর অবধি।

এতো কান্নার ঢেউ ভিতরে জমানো ছিল, জমে ওঠা
এতো নিষ্পাপ ঝিনুক কে দিল এমন যথেচ্ছ ছড়িয়ে?
মহাকাল হাত ধরে, নেমে যাব অই সে অতল
তুমি নারী, তুমি কত মুদ্রায় আর ডাকবে ফেরাবে!

আড়াল তুলে দেখি এঁকে গেছ ছবি, কিছুটা নিষ্ঠুর
সূর্যোদয়ের দৃশ্য নেই তবু এক ঝাঁক পাখি উড়ে আসে
সে ছবির কাছে, ঘুরে ঘুরে গান গায়, নাচে। তবু
আমি জানি যতোদূর শিকড় নেমেছে—তত দূরই
মাটিতে পোড়া পোড়া দাগ, প্রেমিকের শব্দের গন্ধ।

বৃন্দাবন দাস

আমি যখন পোস্টম্যান

'৮৪-র মার্চ। আমি পোষ্টম্যান
মাত্র কয়েক দিনের।
কচি এঁচোড়ের ডালে কোকিলটা
ঘোষণা করছে বসন্ত ও যৌবন;
শানের ঘাটে ডুব্ স্নান সেরে—
বছর দশেকের ল্যাংটো মেয়েটা
দৌড় দিল, ভ্রূক্ষেপহীন।

ঠিকানা খুঁজে চলেছি—

দরজায় হাঁক দিতে লজ্জা হলো,
নিরুপায়; বন্ধ দরজায় কান রেখে
নিচু স্বরে বলি—'কেউ আছেন?
চিঠি ছিলো।'
জানলায় বসন্তের রঙ—
সে বলে—'কার চিঠি?'
সুমিতার।
হ্যাঁ; আমি-ই।
তারপর হাসি দিয়ে মিলিয়ে গেল।

আমি ফিরতে থাকি—

সুমিতা কি কোনোদিন দৌড়েছিলো
ওই/ল্যাংটো—উদোম!

মধুসূদন চাবরী

হে, সূর্য

দুপুর ঝুলে পড়ছে বারান্দায়
বৃদ্ধ সূর্য, ভ্রূক্ষেপ করছো না কেন ?
বর্মবৎ মেঘের আড়ালে মেধাকুণ্ডলী ঢেকে নিলে
মহা আকাশের নীচে অপেক্ষমান প্রাণীকুল
হতাশায় ভিজে যায়।
ক্লিষ্ট বৃক্ষের সবুজ পুঁথির পাতায়
তুমি কণা-কণা রশ্মি-রস দিলে কই ?

দুপুর ঝুলে পড়ছে বারান্দায়
ঘূর্ণ্যমান চরাচরে প্রবল ঘূর্ণি
হে সূর্য ! আমাদের অন্ধকারে রেখে চলে গেলে
আগামী প্রভাতে তুমি অন্ধের উপমা হবে।

সুব্রত মণ্ডল

কার কাছে শিখেছিলে

কার কাছে শিখেছিলে ভাঙা অক্ষরে লেখা প্রেমের নিলীমা
কার কাছে শিখেছিলে নত করা মুখের স্বরবর্ণ
কার কাছে শিখেছিলে জীবনের ব্যস্ততা
কার কাছে শিখেছিলে আলতো করে ছুঁতে হয় ঈশ্বরের চোখ
কার কাছে শিখেছিলে কবিতায় ভরে ওঠে আকাশের গান
কার কাছে শিখেছিলে দুঃখী মানুষের শহর এই কলকাতা
কার কাছে শিখেছিলে পাথরে ফোটানো হয় ফুলের উৎসব
কার কাছে শিখেছিলে পৃথিবী জুড়েই আছে শিল্পের সুষমা।

শিক্ষার অলংকার পরে হেঁটে যায় কঙ্কালের শরীর
আবহমানতায় জেগে ওঠে জীবন সংগীত
চোখ খুলে দেখার ঐশ্বর্যে, যে টুকু শিখেছি শুধু
সাদা দেওয়ালের দাগে ছুঁতে চাই তাকে, আর কিছু নয়।

রূপ সাহা

শব্দ যুগ

এক উড়োজাহাজের কথা ভাবি।

পাখির মতো ডানা মেলে যে উড়ে যায়
প্রশান্ত-মহাসাগর।
দেখি— তার তেল-চক্‌চকে কক্‌পিটে
ভর করছে বাতাস, সিলভারি মুখ থেকে
ফোয়ারার মতো ঝলকে ঝলকে বেরিয়ে আসছে
টিয়ারঙ .....
আর ধাতব—উড়ুক্কু শরীর ক্রমশঃই
হয়ে উঠছে এক ঝিপ্‌সি নর্ত্তকী।

আমিও এক উড়োজাহাজ হ'বো।
জ্বালানীর জন্য বুকের মধ্যে ভ'রে নেবো
লক্ষ শব্দমালা।
তারপর হাজার হাজার মাইল অন্ধকার পথ পেরিয়ে
তৈরী করবো এক আশ্চর্য শব্দযুগ।

গভীর এরিয়েল থেকে কথা বলবো
ভিন্‌গ্রহী মানুষের সঙ্গে।
দেখবো— কালো টানেলের মতো আকাশে
ছড়িয়ে পড়ছে হাজার উড়োজাহাজ।
আর এক একটা ডানা লাগিয়ে
নক্ষত্রলোক থেকে
পাখির মতো উড়ে আসছে মানুষ।
তাদের ধাতব শরীর থেকে
বেরিয়ে এসে এক উড়োজাহাজ
আশ্লেষে চুম্বন করছে আরেক উড়োজাহাজকে
তৈরী হচ্ছে এক নতুন সভ্যতা।

কৃষ্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

অমোঘ

তোমার হাঁটুর কাছে পবিত্রভাবে হাত রেখে বলি—
এতদিন অযাচিত যেটুকু এসেছ পেয়ে,
যদি বিবেকের দংশন নাও;
মুক্ত হ'তে তুচ্ছ কিছু দিতে চেষ্টা করো
এসবই আমি নেব বিনিময় হিসেবে—
সঞ্চিত দানের একত্রিত পুণ্য বিনিময়,
দাও
যদি পারো আমাকে
সান্নিধ্যে না থাকার যন্ত্রণা—
অমোঘ

বিশ্বজিৎ পাণ্ডা

ফলিডলের শিশি

অব্যাহতিহীন বিপন্ন হস্তমৈথুন থেকে সশরীরে উঠে আসছি আমি।
হাতে মারণাস্ত্র নেই, তবু তোমরা কঠিন নিরাপত্তার দাবি করো
নইলে এই তোমাদের অনির্বচনীয় স্তনচূড়া, এই কমন বাথরুম
নইলে এই তোমাদের অনির্বচনীয় রান্নাঘর, এই অনন্ত প্রদাহ
নইলে এই তোমাদের অনির্বচনীয় হাহাকার, এই মাংসপিণ্ড
---- দূরে, ঈশায় এক অজ্ঞাত জাহাজ থেকে
মধ্যরাতে ঝাঁপিয়ে পড়বে প্রিয় কবির এপিটাপের মধ্যে
তোমরা আমার জন্যে সামান্য অপেক্ষা করো—
আমি মেদিনীপুরে ফেলে এসেছি আমার রুমাল, দলিল দস্তাবেজ
মাধ্যমিকের রেজাল্ট, ফেলে এসেছি আমার মৃতদেহের একান্ত শরীর
তোমরা আমার জন্য সামান্য অপেক্ষা করো, দেখো
বিপদমুক্ত অ্যালকোহল থেকে কলকলিয়ে উঠছে গজদাঁত, দেখো
মহাপাপী কচুবন থেকে জেগে উঠেছে ফলিডলের শিশি, এই দেখো
আমাদের অবহমান গাড়িবারান্দা থেকে আস্তে আস্তে উঠে আসছেন
আমার মা, হস্তমৈথুনের দেবী।

অলোক গোস্বামী

ক্রমশঃ প্রকাশ্য

ভালবাসা শুরু হওয়ার আগেই বালতি ভর্তি
জলের কাছে উবু হয়ে বসে পরছে প্রিয় নারী
আমি বোকামীর চেয়েও ধীর গতিতে
উত্থিত পুরুষাঙ্গের মাথায় টাঙ্গিয়ে দিচ্ছি
আশা ভঙ্গের কালো ফ্ল্যাগ হায়
ধর্ষণের কোন বিকল্প নেই

আমার বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে এ শহরের সমস্ত ল্যাম্প পোষ্ট
দেওয়াল—বেয়ারীশ কুকুর—সৌখিন বিদ্রোহী—নামাকাঙ্খী লেখক
একে একে চলে যাচ্ছে সমস্ত হিজড়েরা শহরে চীৎকার করে
ছুটে যাচ্ছে দমকল সরু হতে হতে উধাও হয়ে যাচ্ছে রাস্তা
সমস্ত জেলখানায় বাজছে হুঁশিয়ারী পাগলা ঘন্টা
শেষ সরাইখানা আমাকে আশ্রয় দিয়েই বুটের ঠোক্করে
ঠেলে দিচ্ছে বাইরে সমস্ত নিয়ন সাইন আমাকে জানাচ্ছে
তুমি যে গেলাসে জল খাও সে গেলাসেই পেচ্ছাপ করো
অতএব হে কালোমানুষ যাও সংবিধান এবং হামাগুড়ি শেখ

আমাকে আরো মদ দেয়া হোক রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে
স্বপ্নের ভেতরে ভরে আসুক সাদা মদ সবুজ মদ কালো মদ
আমি সমস্ত দেয়ালে টাঙ্গিয়ে দেবো গণধর্ষণের স্মৃতি
পোড়া মাংসের গন্ধে সবাইকে ডেকে এনে বলবো আর
যত রকমে পারি মুখ ভ্যাংচাই—উলঙ্গ হয়ে বলবো
শোন্ লিঙ্গ আঁটার বিকল্প নয়

মাতাল শহর আমি আবার ফিরে এসেছি নিজস্ব যৌনতাসহ
দরজা গোল সুখী মানুষেরা এসো
মুখোমুখি হই মর্গের বারান্দায়
তোমাদের শ্রদ্ধা কিম্বা ঘৃণা— মৈত্রী কিম্বা আঁতাতের
ইতিহাস প্রয়োজনহীন আজ
আমি সমস্তই চুর্মার করে দেবো।

যৌন জ্বরে জলসায়

অংশুদেব মণ্ডল

—অভীক, আজ রাতে ঘুমোস।

—হাসচিস্! তোর শরীর কত খারাপ হোয়ে গ্যাছে দেখেছিস্। প্রিয় অভীক আমার কথা শোন্, অন্ততঃ চারটে ঘণ্টা ঘুমোস। নইলে মারা পড়বি।

সে হেসে উঠল এবং বলল—জীবনটা কি, যে তার উত্তর পায়নি তার আবার মৃত্যুভয়। কেন এই বেঁচে থাকা? তা সত্ত্বেও মৃত্যু হবে জেনেই তো আমার প্রশ্ন খোঁজা আর এই দুঃসাহসিকতা। আমার থেকে প্রিয়জন কে থাকতে পারে। আমি একটা দেশ কিংবা পৃথিবী। সৈনিক তো দেশের স্বার্থে বোমারু বিমান নিয়ে শত্রুপক্ষে হানা দেয়। না হয়, আমি নিজেকে জানতে বা জীবনের অর্থ কী খুঁজতে শেষ হোয়ে গেলাম। তবু আমার কিছু কথা লিখে যেতে পারবতো।

—হ্যা, লিখতে পারছিস বলে খুব অহংকার যে তোর!

—হ্যাঁ, এই অহংকার বোধহয় মানুষকে বড় করে।

সন্ধ্যায় এই রকম অন্তরঙ্গ কথাবার্তা হচ্ছিল অভীকের দুই বন্ধুর সঙ্গে। আকাশে তখন এক ফালি চাঁদের আলোয় বাদুড় উড়ে যাচ্ছিল। খোলা মাঠের বাতাস বটের পাতায় পত্ পত্ শব্দ তুলছিল। টিঁয়াও পাখিটা আজো খোলা মাঠে একা একা কাঁদছিল।

শ্রীধর গল্প কোরছিল কোন একদিন গুরুনিতম্বে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা। নির্জনে যৌন আমেজ বেশ জমে উঠেছিল। সে সঙ্গম কে পৃথিবীর আদিমতম সৎ প্রবৃত্তি মনে করে। হঠাৎ যৌনতা অন্তরঙ্গতা এবং খুশীর কারণ ওদের এক বন্ধু লিখতে পারছিল। তাতেই তারা সেলীব্রেট করল এই রাতকে।

রাত দশটা পঁয়তাল্লিশ।

পৃথিবীর নপুংসক পুরুষের বীর্যে সিফিলিসের এইডসের জীবাণু। প্রিয় মহিলাদের প্রতি বিশেষ অনুরোধ যথেচ্ছাচার সঙ্গম করবেন না। কাগজ খুলেই অভীক লিখে ফেলল। অনেকদিন সে একটাও চিঠি পায় নি। ভিতরে অস্বস্তি।

খস খস কোরে লিখছে আর ছিঁড়ছে। মাঝে মাঝে ঘরময় পায়চারি কোরছে। আসলে মাঠের বাইরে আরো একটা মাঠ থাকে, যেখানে খেলা বন্ধ হয় না।

জানলার বাইরে থেকে একটা কাগজ তুলে নিলাম। লেখা—গোপা গান শিখছো না কেন? কাল রাতে তোমার গান শুনলাম। তখন আমি নিঃস্বর্গ চেতনায় পৌছে গিয়েছিলাম। কেটে নিচে লেখা—ঈশিতা, বড় ভাল লিখছিস, তোর পা দুটো এগিয়ে দিবি? কারণ ছোট হোলেও শিল্পী মহৎ। তাকে সম্মান দিতে হয় সেটা আমরা ভুলে যাচ্ছি। তাছাড়া মান-সম্মান, গুরুজন লঘুজন, উচ্চ নীচ এবং নারী পুরুষের সম্পর্ক মুছে ফেলে সকলের কাছে পৌছে যেতে চাই। তোরা যে মাটিতে দাঁড়িয়ে আমাকে আনন্দ দিচ্ছিস, সেই মাটিতে দাঁড়িয়ে আমি তো কিছু দিতে পারছি না!

অন্য একটা কাগজ তুলে দেখি—'গত রবিবার থেকে ঘুম নেই। আজো রবিবার চলে গ্যাল। শর্ত মত তোমার কাছে যাওয়া হল না।' কেটে দিয়ে লেখা—'শালা' কেউ কারোর কাছাকাছি যেতে পারে নাকি।' তারপর লেখা—'হয়তো তুমি কিম্বা আমি পরিস্কার কোরে বলতে পারিনি—ভালোবাসি।' ব্রাকেটে লেখা—'কেউ কাউকে প্রকৃত ভালবাসে কি।' মনে হয় সবই নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে বা দৈহিক স্বার্থে মনের লেনদেন। আবার লিখেছে আমি আত্ম তৃপ্তির জন্য কাজ করি। চিঠি না পেলে ক্ষেপে যাই। তোমার ক্ষেত্রটা ভাবিনি তুমিও ক্ষেপতে পারো। আসলে বিংশ শতাব্দীর মানুষ নিজেকে নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত। প্রিয়তমা, সত্যি কথা বলি রাত হোলে তোমাকে কাছে পেতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে তোমার বুকে মাথা রেখে ঘুমিয়ে থাকতে। কিম্বা তোমায় প্রণাম কোরে পৃথিবীর বিরলতম দৃশ্য দেখতে চাই।'

অভীক পায়চারী করছিল ঘরের মধ্যে। সিগারেটের আগুন নিভতে সন্ধ্যা দিচ্ছে না। বাইরে থেকে ডাকলাম—অভী, আজ বাইরে যাবে না? চোখ তুলে তাকাল। কালো পেনটা মুড়ে রেখে বাইরে এল। বললাম—কোথায় যাবে?

—পশ্চিমপাড়ার দিকে—, না-না স্টেশনের দিকে চলো। এত অস্থির কেন?

—'আজ সন্ধ্যে থেকে মাথায় যৌনতা ঢুকে পড়েছে।

আমি হাসলাম কিছুটা। বললাম—তা, তুমি যৌনতায় শিল্পের গন্ধ পাও না? 'পাই না মানে, ওটাইতো শিল্পের রঙ, রস, আনন্দ। —অর্থাৎ?

—অর্থাৎ, শ্রীধরের ভাষায় বলি সঙ্গমের সময় কোন অতীত ভবিষ্যত থাকে না। এ বিষয়টা উপলব্ধি করিনি কোনদিন। তবে জানি প্রত্যেক বিপরীত লিঙ্গ ওই মুহূর্তের জন্য জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয় করে। কল্পনায় দেখেছি ঠিক সেই সময় হয়তো কোন দৈন্য, কোন অভিমান কিম্বা কোন অহংকার থাকে না। বেশ্যা পয়সার জন্য দরজা খুলে ধরে। তারপর শান্তিস্বর্গ। কিন্তু সঙ্গমের পরে কড় কড়ে নোটের শব্দ এবং সেই দৈন্য ক্লেষ এবং ঘেন্না। মনেকরি এই আনন্দ বিষাদ অনুভূতি স্ত্রী থেকে বান্ধবী কিম্বা অন্য কারোর ক্ষেত্রে সমান। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে? অনেক নারীকে কাছে পেয়েছি। তাদের স্পর্শ ও গন্ধ পেয়েছি। শুধু ওইটুকুই আমাকে বিস্মিত কোরেছে। আরো প্রশ্নময় কোরে তুলেছে। প্রত্যেক পুরুষের মত আমার মধ্যেও একটা নারী আছে। তার সঙ্গে, অভিনয় করি। ধর তাকে বললাম—'চলো বিছানায় যাই।' সে বলল 'আলোটা নিভিয়ে দাও।' আমি—'কেন?' সে-'অন্ধকার ছাড়া আমরা নিবিড় হোতে পারব না।' আমি—'আমি কিন্তু তোমাকে নগ্ন অবস্থায় দেখতে চাই।' সে—'বেশতো, হাত বুলিয়ে বুলিয়ে আমাকে উত্তেজিত কোরে তাখ। যতদিন না পর্যন্ত আমাকে দেখতে পাবে, ঠিক ততদিন তোমার ভালবাসা অটুট থাকবে। তুমি, আমার উরুসন্ধিতে হাত রেখে মুখ তুলে যাবে। স্তন দুটোকে পেয়ে আমাকে তুলে যাবে। তারপর সঙ্গমের মুহূর্তে আমরা এক হোয়ে যাবো। খাতার পৃষ্ঠায় লিখবে একটা গল্প, পদ্য কিম্বা গল্প। কারণ আমি সবসময়ই কবিতা?

বলে সে চুপ করে গেল। বললাম—'তারপর?'

সে গম্ভীর হয়ে বলল 'বিছানার পাশে বালিশ আছে তো?

পাশের বাগান থেকে মৃদি ফুলের গন্ধ বাতাসে ভেসে আসছিল। হাল্কা বাতাসে বাঁশের মাথা দুলছে। গাছে পাখির ডানা ঝাড়ার শব্দ হলো। বললাম —শুরু করো।'

—তারপর আমি আস্তে আস্তে তার কাপড়, শায়া, ব্লাউজ এবং ব্রাটা খুলে দিই। সে আমাকে চুম্বন কোরতে থাকে। তার নরম দেহে হাত রাখি। বলি —চলো, ভিতরে ভীষণ গরম, বাগানের বারান্দায় গিয়ে বসি। সে হাঁটতে থাকে আমার সঙ্গে। বারান্দায় পরিষ্কার মেঝেতে বসে বলি—আরো কাছে এসো। সে স্থির থাকতে পারে না। টাউজারের দড়িতে টান দেয়। আমি চিন্তা কোরতে থাকি কেন? কেন? কেন? কেন এই প্রেম, এই কাম, এই ক্রোধ? সে

ঘামতে থাকে। আমি নির্বিকার। প্রশ্ন ছুঁড়ে দিই অণুপরমাণুতে। জীবনের অর্থ কী? সেখানে শুধুই কি শূন্য? তবে কেন জন্মগ্রহন এবং জন্ম দেওয়া? আবার আমাকে চুমো খায়। আবার প্রশ্ন—কেন ব্যস্ততা? বেশ সন্দেহ? কেন স্বার্থপরতা? আমি কলম ধরি। উত্তরের বর্ণমালায় খস খস কোরে লিখে যাই। হয়তো তৃতীয় লেখা।

দুজনে চুপ কোরে বসে থাকি। হাঁটতে হাঁটতে নেমে পড়ি মাঠে। এক জায়গায় এসে বলি—বসো। অভীক বসেই পটপট কোরে ঘাস ছিঁড়তে থাকে। দূরে কুকুর ডাকার শব্দ হয়। নিমগাছের ডাল কেটে নিয়ে গ্যাছে কারা। খেজুর গাছ থেকে খেজুর ঝরছিল দুটো একটি। পাশের ঘরে তাঁতের শাড়ি পাল্টাবার শব্দ গাছপালায়। বললাম—তোমার এ নারী আমাকে ভার কোরে তুলল। তুমি অন্য-শরীর কথা বলো।

—ঘুম ঠিক জমবে না?

—বাজে কথা বলো না।

—ঠিক আছে বস্। ধর এবারের জন সমাজ সংকীর্ণতার আড়ালে উত্তেজিতা কোন এক নারী। নিভৃতে বুকটা জলছে। মানে অপ্রকাশিত মানসিক যন্ত্রনার প্রতিক্রিয়া। আমি তার কাছে গেলাম। বললাম—'কি কোরছ?' সে—'এই বসে আছি।' আমি—'রাত কত হোয়েছে জানো?' সে—'সাড়ে এগারোটা, বারটা হবে।' আমি—'শুতে যাবে না?' সে—'কেন, চলে যাবে নাকি?' আমি—'হ্যাঁ—, কিন্তু হঠাৎ—।' সে—'না—, বাবামার আসতে এখনো ঘন্টা খানেক দেরি হবে। তাছাড়া তুমতো রাত কোরে শোও।' আমি 'তা হয়তো ঠিক কিন্তু—।' সে—'তাখ, তাখ লুব্ধক কেমন জলছে?' আমি—'কই।' সে—'এখান থেকে তাখ।'

কথা বন্ধ কোরে অভীক আমার দিকে তাকাল। ওর গল্প শুনতে শুনতে আমি বোধহয় অন্যমনস্ক হোয়ে পড়েছিলাম। সে বলল—তোমার ঘুম পেয়েছে বাড়ি যাও।

—সে কি! আমি সব শুনছি। তুমি বলে যাও।

সে চুপ কোরে রইল। বললাম—কি হলো?

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল—'এতো ধ্বজভঙ্গ পুরুষের কল্পনা। এ গল্পে তুমি অহেতুক উত্তেজিত হবে। কি হবে এসব শুনে?'

—যা হয় হোক, তুমি বলো।'

অভীক সিগারেট ধরাল। উঠে দাঁড়াল। কয়েক পাক ঘুরে বলল—তার কাছাকাছি হোলে বুকের স্পর্শ পাই।' একটা হাত পিঠের ওপর এসে শক্ত হয়ে যায়। আমি এগিয়ে যেতে থাকি জটিলতায়। কেন এই সংকীর্ণতা? সময় নিয়ে দেখতে থাকি। সে সময় রাতের তারা, জোনাকি ও গাছপালাকে আমার ভাললাগে। আঃ লুব্ধকের মত হোতে থাক সেই নারী। আমাকে জড়িয়ে ধোরে বালকের মত আদর কোরতে থাকে। তখন আমার চোখে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র নক্ষত্র এবং জোনাকির বিক্ষিপ্ততা। সে কাপড় কিম্বা গাউনটাকে হারিয়ে ফ্যালে। প্রশ্ন করি কেন? কেন? কেন? আমি ফিরে দাঁড়াই। শব্দের সাম্রাজ্য থেকে সৃষ্টি হয় এক একটা স্তবক। ব্রা কিম্বা টেপটাকে খুলে দিই। বুকের ঠিক মাঝখানে চুমু খাই। তার বেহালার তারে ছড় বোলাতে থাকি। নতুন সুর সৃষ্টি হোতে থাকে। আর দেখতে থাকি এক কুমারী বুকে জড়িয়ে থাকা মাতৃত্বের ছবি। উঠে দাঁড়াই। রাস্তার পাশে যাই। একটু ইয়ে পেয়েছিল। কিন্তু ভাবছিলাম অভীককে। এই প্রথম তাকে দেখলাম যৌন ভূষণে। আবেগ তাড়িত হোয়ে প্রেমের চিঠি লেখা আর স্বামী স্ত্রীকে ধর্ষণ করা দুটোই সমান। মনে হয়, সঙ্গম হয় খুব কম. ধর্ষণই বেশী। আমাদেরকে এমন অনেক কাজ কোরতে বাধ্য হতে হয় যা ইচ্ছার বিরুদ্ধ। উঠে এসে দেখি অভীক বাবলা গাছে কি যান খুঁজছে! জিজ্ঞেস করলাম—'কি দেখছ?' —'তোমার উত্তর খুঁজছি।' —'মানে?' —'মানে, তোমার তৃতীয় প্রশ্ন সব বয়সের লোভ সেই নারীর কথা।'

হাসি চাপতে পারলাম না। মিথ্যে বলেনি আমি এই কথাই বলবো ভাবছিলাম। বললাম—তবে শুরু কোরে ফ্যাল।

যতখানি উৎফুল্ল হলাম ঠিক ততখানি সে গম্ভীর হয়ে গেল। আত্মমর্যাদা তাকে শুব্ধ করছে তা বুঝতে কষ্ট হলো না। একি! হঠাৎ সে হেসে উঠল। বলল—'সবই কাঁচা বয়সের দোষ।' —'হঠাৎ কি হলো?' – 'না কিছু নয়। হ্যাঁ শোন। ধর ফ্রকপরা একটা মেয়ে, আমাকে ফুল দিতে এল একদিন। বললাম—'বাঃ ভালো ফুল এনেছো তো!' সে—'তোমার পছন্দ তো?' আমি—হ্যাঁ, তোমার মত' তার মুখলাল হোয়ে গেল লজ্জায়। কিছুক্ষন চুপচাপ থাকার পর প্রশ্ন করল—'তুমি, আমার থেকে কত বড় হবে?' আমি—তা ধর প্রায় আট

নয় তো হবেই।' সে নিচু হোয়ে বলল—'এমন কিছু নয়।' দেখি সে আমার চেয়ার ঠেস দিয়ে দাঁড়াচ্ছে। উঁকি মারে শিক্ষার আলোক পথে নামের লোভ ও মোহ এবং দ্বিধাগ্রস্থ অনেক প্রশ্ন। খুব কাছাকাছি একেবারে গা ঘেঁষিয়ে। আমি লোভী হলাম। সঙ্গে সমপরিমাণ অপরাধ বোধ বা সংশয়। একদিকে সে এবং নরম দেহ, অন্যদিকে আমার goodness অর্থাৎ মানসিক সততা। একদিকে ড্যান্সিং ফ্লোরের অর্ধনগ্ন নর্তকীর পায়ে পা মিলিয়ে, অন্যদিকে কালো হাঁড়ির জলভাত। একদিকে বুক সেলফ অন্যদিকে পায়ের ছেঁড়াচটি। না, ওখানে আরো কিছু আছে নিশ্চিত। বললাম—'বাঃ জামাটাতো বেশ।' সে হেসে বলল—'পিছনের বোতাম কটা খুলে দাও। দেখবে ভিতরে আরো একটা কি সুন্দর জামা।'

আমার জানার ইচ্ছা প্রবল। সত্যি কী সুন্দর আরো কিছু থাকতে পারে? যা দেখছি তার থেকেও! খুলে দিলাম। বাদামী কালো দেহের অধিকাংশ সূর্যোদয়ের মতো সৃষ্টি আর ধ্বংস বা ভাবা আর ভালবাসা বা অন্ধকার আর সঙ্গম। আঃ কী সুন্দর। কিন্তু কেন? মুহূর্তে পড়ে ফেলি তার ভাষা। তার চোখে ভেসে ওঠে য্যান, সন্ধ্যায় দোলায় বসে চাষী বৌ-এর ছেলে ভোলানো গান বা পাগলের মুখে হঠাৎ পেয়ে যাওয়া দুটো বাসী রুটি। হায়, পাগলীটার দেহ উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে। আমাকে ধরো আমাকে ধরো' এই রকম চোখে, মুখে দেহে আর্তী। জমে ওঠে আমাদের লুকো-চুরির খেলা। যেমন লুকোচুরির খেলা জমে লেকচারের ধাঁধায় ব্যালট পেপার। হা—হা আগেই বলেছি কাঁচা বয়সের দোষ। একদিকে দেহের অর্থনীতি আমাকে বলে—এসব ভোট ফোট বাদ দাও। কারণ তারা কেউ সৎ নয়। প্রথমে প্রত্যেক মানুষকে স্বীকার করো। মানুষ দাবার ঘুঁটি কিম্বা পঞ্চদশ শতকের ক্রীতদাস নয়। আগে প্রকৃত শ্রমিককে পাশ করিয়ে বিশ্বকর্মা গড়ো। বিজ্ঞানী, দার্শনিক, ডক্টর তোমরা খেটে খেটে মরছ আর মেরে ফ্যালার ব্যবস্থা করছ। কি হবে এইসব খুঁথিগত শিক্ষা, এইসব শিল্প সাহিত্য কোরে? অন্যদিকে কাঁচা বয়সের আবেগ বা মোহ আমাদের রাজনীতি। আমাকে অন্ধগলির মধ্যে দাঁড় করিয়ে বলে—আমাকে চেনো। আমি দেশকে চালাচ্ছি, তোমাকে খাওয়াচ্ছি। ওরা (বিপরীত) তোমাদের কথা ভাবেনি কোনদিন। আর ভাববেও না। এ প্রান্তে ধাক্কা খেয়ে ও প্রান্তে যাই। ওরা সবাই নিজেদেরকে যুধিষ্ঠীর বীর্যে জন্ম বলে মনে

করে। কিন্তু প্রমাণ দিতে পারে না কেউ। আসলে ছেলেমানুষ না? অপর প্রান্তের লোকেরাও বলে আমাকে ছ্যাখ, চেনো, মানো। এদিকে যেটা ঘটনা সেটা দিনে রাতে বোম পড়ে, রক্তে আমার বাবা কিম্বা বোন পড়ে থাকে। আমার মায়ের সঙ্গে আমার আর ভায়েরা পাগল হোয়ে যাচ্ছে। দুঃশালা, শিল্পীর আবার রাজনীতি? ওহে আমার জনদরদী বন্ধুরা তোমরা নীতিটীতি নিয়ে থাকো। শুধু আমাকে চিন্তা কোরতে দাও।

আসলে ফ্রকের নীচে এই তাজা যৌবন বড় লোভনীয়। হর্ষ এবং বিষাদ। দুটো একটা সার্টিফিকেট পাওয়া। তরুণ তরুণীরা প্রাপ্ত বয়সের মুখেই ফেস করে এই যৌবনকে। অর্থনীতি কিম্বা রাজনীতি, যা ঢলঢলে লাবণ্যপূর্ণ। তাই নয় কী?"

—হ্যাঁ, তারপর তুমি কি করলে?'

—না, না, আমি কিছুই করিনি। একবার তার জামাটার দিকে তাকালাম। তারপর সেটা পায়ের দিক থেকে উপরে তুলে ধরে বললাম—'খুকী, জামাটা পরে নাও'।

আবার নিরবতা। একটা কটকী ব্যাঙ থেকে থেকে ডাকছে। চারদিকে ঘ্যান অন্ধকার ছেয়ে আসছে। খারাপ লাগছিল। অল্প চাঁদের আলোয় দেখলাম অভীক অস্বাভাবিক গম্ভীর। অজানা উত্তেজনায় তার চোখ জ্বলছে, শরীর কাঁপছে, ঘন ঘন মাথার চুলগুলোকে উড়িয়ে দিতে চাইছে। আমার ভয় করছিল কেমন, ভীষণ অস্থির মনে হচ্ছিল। অন্ধকারে কিছুটা ঘুরে এসে দাঁড়াল। সিগারেট এগিয়ে দিলাম। ধরাল এবং বলল—তোমাদের মত, শ্রীধরের মত আমারও গুরুনিতম্বের ওপর, স্থূল অঙ্গের ওপর লোভ আছে। আমি স্থলভাসা জলের দিকে চেয়ে থাকতে ভালবাসি। কিন্তু যখন প্রশ্ন করি কেন? তখন সবই অর্থহীন এবং সাময়িক। এবার প্রশ্ন কেন এরকম চিন্তা? তার উত্তর বীর্যের পরিশুদ্ধি প্রয়োজন।

তারপর গলা নামিয়ে বলল—আমাদের চারদিকে নারীময় অনেক কিছু আছে। যাদের সঙ্গে প্রায়ই বৈধ এবং অবৈধ সঙ্গম ঘটছে। সেই বাদবিচারহীন সঙ্গমের ফলে বীর্যের পৌরুষত্ব নষ্ট হচ্ছে। সিফিলিস, এইডসের মত যৌন রোগ মানবিক সভ্যতায় ছড়িয়ে পড়ছে, বিকলাঙ্গ করে তুলছে।

আবার বেশ কিছুক্ষণ কথা না বলেই কাটল। এক সময় বললাম
—অনেক রাত হয়েছে।

———

আলোচনা

স্বজন বিদ্রোহ ও কবি যোগব্রত চক্রবর্তী

শ্রীধর মুখোপাধ্যায়

'এই শেষবার অষ্টাদশী
কয়েকটি লাইন লেখা হোল
শুধু তোমার জন্যই
একান্তই ব্যক্তিগত
হয়তো বা পরের বছরে
তুমি অন্যের গৃহিণী
তোমার শরীর-সহ সব কিছু
জেনে গেছে সুখী একজন
তাকে আমি ঈর্ষা করি দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে আহ্বান জানাই।'

হয়তো বা
'তাপদগ্ধ পঁচিশে বৈশাখে
তুমি এসে সামনে দাঁড়াবে
"কেমন আছেন এখনও কবিতা নিয়ে"
আহাম্মক যোগব্রত হতভাগ্য চারুদত্তের উপমা আওড়াবে
তারপর বিনামূল্যে পত্রিকা গছাবে।
তাই শেষবার অষ্টাদশী এই শেষবার
কয়েকটা লাইন নিয়ে স্মৃতি থেকে সরে যাওয়া চাই।'

এই কবিতাটি লিখেছেন যে তরুণ তাকে আমি দেখিনি, দেখিনি সেই অষ্টাদশীর কোন ফোটোগ্রাফও। অথবা কলেজ স্কোয়ারে বিষণ্ণ ও স্বপ্নময় চোখে বসে থাকার, সময় হরণের বিপন্নতা কিম্বা সোঁদা গন্ধভরা একতলার ঘরে বসে রোদ ঝলমল কলকাতার সকাল দেখতে দেখতে এক আগ্রাসী অবলম্বনহীনতা—গ্রাস করে যাকে সে একজন কবি। শুধু মাত্র এই পরিচয়। তিনি সে কবিতা লেখেন

তা আর খুব ব্যক্তিগত। হৃদয়ের গোপন ওম তাতে লেগে থাকে। কারো অনুগ্রহ নয়, স্বীকৃতি নয়, বিষণ্ণতার সেই ঈশ্বরীর জন্যও নয়। এ যেন তার হৃদয়ের বিভিন্ন সময়ের অদৃশ্য ফোটোগ্রাফ।

'স্বজন বিদ্রোহ', যোগব্রত চক্রবর্তীর প্রথম কবিতা বই। যা তার অকাল মৃত্যুর পর বন্ধুদের দ্বারা প্রকাশিত ১৯৭৮ সালে। ৪০টি কবিতার এক সংকলন।

পেয়ে গেলাম একজন 'কবি'কে। যিনি শুধু কবিতার জন্য। কবিতা যার কাছে একমাত্র আশ্রয়। গোপন যন্ত্রণা ও সলজ্জ উষ্ণতার অনুভূতি প্রকাশের একমাত্র মাধ্যম। আয়নায় সেই অনুভূতিকে দেখার জন্যই যেন কবিতা। কমিটমেন্ট! না। কাউকে বলার কোন কথা নেই তার। মধ্যরাতে আবুক শূন্যতা নিয়ে একাকী এ যেন নিজের সঙ্গেই মৃদু কথোপকথন। 'ব্যক্তিগত কবিতা' শব্দটি সৎ অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে যোগব্রত চক্রবর্তীর ক্ষেত্রে। কবিতায় তার সবকিছু বলা, যা বলার জন্য কোন আধুনিকতম যন্ত্র বা ব্যবস্থাই সার্থক নয়।

কবিতায় এই গভীর আন্তরিক স্পর্শ আজ আমাদের কাছে প্রায় নিশ্চিহ্ন। কবিতা আজ লেখা হচ্ছে, সৃষ্টি হচ্ছে না। অলঙ্কার, শব্দ, তরঙ্গ, ছন্দ-এর বিভিন্ন রঙীন ব্যবহার, আকাশ সমান কথা; অযৌক্তিক অলীক, জীবন ও সময়ের থেকে বিচ্ছিন্ন ধারণা এসবের ব্যবহার দিনদিন বেড়েছে। খুব নগ্নভাবে বলতে গেলে বিগত বেশ কিছু বছরের কবিতা ফাঁপা, আত্মাহীন, বহুতল বিশিষ্ট মিথ্যাচার যার সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে কবির—তার ধারণা ও অনুভূতির কোন যোগ নেই।

'রোমান্টিকতা' শব্দটি বহু ব্যবহারে ও অপব্যবহারে এর নিজস্বতা হারিয়েছে নিশ্চয়ই কিন্তু প্রকৃত রোমান্টিকতা ও নান্দনিক বোধ এক অপূর্ব মানবিক ঐশ্বর্য্য। আমাদের সময়ের মানুষদের থেকে যা অতিক্রান্ত নিঃশেষিত হচ্ছে (যদিও তার কারণগুলি সত্য) কবিতায় কবি যদি সম্পৃক্ত না হন বা কবিতা যদি বাহ্যিক আবরণ মাত্র হয় এবং নিজস্ব মানবিক বোধহীন হয় তবে তা আর কবিত থাকে না।

যোগব্রতর কবিতা পড়তে পড়তে আমরা মানুষটাকে পেয়ে যাই। বুঝতে পারি কত আন্তরিকতা ও জীবনযাপনের ঘটনাপুঞ্জের ব্যক্তিগত প্রতিফলন থেকে লেখা হয়েছে কবিতাগুলি। হয়ত কখনও তার কবিতা অতি সরল, অতি

সামান্য আশা-হতাশার প্রক্ষেপ এবং নির্দিষ্ট আদর্শহীন তবু তার ব্যক্তিগত অনুভূতির রঙকে তিনি ইউনিভার্সালাইজ করতে পেরেছেন। কাছের মনে হয় কবিকে, মনে হয় এ কবিতাটা তো আমারই, আমিই তো লিখতে পারতাম ঠিক এই কথাগুলি। যোগব্রতর কবিতার আকর্ষণ এখানেই।

প্রেম, প্রেমহীনতা, বন্ধুত্ব, প্রকৃতি মৃত্যু এবং ঈশ্বর তার কবিতায় ছড়িয়ে আছে। তিনি লিখছেন—'নরম যুগল উরু কারো / কাছে ব্যক্তিগতভাবে মেলে দিতে দিতে, অষ্টাদশী, মনে রেখো, প্রতিশ্রুতি / দিয়েছিলে কাকে?' / এবং তারপরই 'ঈশ্বর কোথায় থাকেন? /স্থলে জলে অন্তরীক্ষে মদের দোকানে / বেশ্যার চৌকাঠে দেখি তাঁর গুণাবলী গচ্ছিত রয়েছে / পার্কষ্ট্রীট মুহম্মান—গভীর ট্রাফিকে— / আমার ঈশ্বর খুটে খান / সরলতা / ভালবাসা / এ দোর ও দোর'

'ঈশ্বর' বারবার নানাভাবে তার বিভিন্ন কবিতায়। কোথাওই এই ঈশ্বর, দেবতা নন; আধুনিক, বিক্ষত, স্বপ্নও আদর্শহীন মানুষের সামনে তিনি এক নীল শান্তি এক নিরবিচ্ছিন্ন শুদ্ধ আর্তের আশ্রয়। যোগব্রত সেভাবেই দেখেছেন। 'ঈশ্বরের কাছ থেকে কি পেয়েছে? / প্রসন্ন দাক্ষিণ্য, / নাকি তারই নাম আলো।' অথবা 'ছন্নছাড়া পদক্ষেপ এখানে সেখানে / ঈশ্বর বসেন এসে গেরস্থের লাউয়ের মাচানে।

মৃত্যু এক অম্লান সত্য। সেই মৃত্যুর চেতনা মাঝে মাঝে ভেঙ্গে দেয় সাজানো বসত, রঙীন চৌরঙ্গী ঘুড়ি, 'হায় মানুষ জানে না তার সঠিক সময় / কখন মৃত্যুর থাম পৌছে যায় / আপন আবাসে' অথবা

'এইবার তবে শেষ খেলা শুরু হোক
বহুদিন হোল গা বাঁচিয়ে বেঁচে আছি
চিন্তা কোরনা কখন কিভাবে থাকি
মৃত্যুর সাথে সন্ধি হয়েছে আজই।'

অথবা

ন লক্ষ কিশোরীর উদ্যত স্তন—ন লক্ষ প্রৌঢ়া রমনীর শান্তিময় কোল,
ন লক্ষ লম্পটের পিতৃত্বের দাবী—অগুনতি বিবাহিত বেশ্যার কলা-
কৌশল—
তবু আমি মন্ত্রের ভঙ্গীতে পিতার নাম উচ্চারণ করি—
"আকাশস্থ নিরালম্ব বায়ুর্ভূত নিরাশ্রয়"

যোগব্রত কবিতার প্রাথমিক ভাব শান্ত ও বিষণ্ণ কিন্তু রামধনু বা শরতের আকাশ তাকে হাতছানি দেয়—কবিতাতে তা স্পষ্ট। আর নারী,—না কোন ব্যক্তি নয়—একটা সৌন্দর্য্য-চেতনা, একটা বিশুদ্ধ এস্‌থেটিক কনসেপ্ট তাও কবিতায় বহুভাবে। কখনো আপন ভাবে, ঘরোয়া ভাবে, কখনো সে 'কোন এক দূরতর দ্বীপ' যোগব্রত লিখছেন :

'যদি বলো তুমি যাবে
তোমার ঠিকানা রেখে দেবো মনে মনে
কোনো বসন্তে রক্তপলাশ দেখো
আমার লেফাফা তোমাকে পৌছে দেবে।'

অথবা

'পড়ন্ত বিকেলের দিকে পিঠ দিয়ে বসে আছো তুমি
উদাসীন ভিখারী বালক এইমাত্র ঘুরে
এলো বোলপুর ভুবনডাঙ্গার মাঠ শূন্য করতলে
তুমি তাকে ফিরিয়ে দিয়েছ ! '

যোগব্রত চক্রবর্তীর কবিতা জীবনের খুব কাছ থেকে কথা বলে, ফিস ফিস করে। তার কবিতা পুরোন হয় না, কারণ কবি এখানে রক্তাক্ত বিপন্ন সময়ে দাঁড়িয়ে থাকা এক জীবন্ত মানুষ, যিনি আক্ষেপ নয় অমোঘ সরল সত্যের সামনে উন্মোচিত করেন নিজেকে।

'সময়ের ঘণ্টা দ্রুত বাজে
নদী জমে বরফ
পাথর জমে পাহাড়
কান্না জমে রক্ত
সেই কথাটা আজও লেখা হোল না—'

অকাল মৃত্যু যোগব্রত চক্রবর্তীর কবিতাকে থামিয়ে দিয়েছে হঠাৎ। তাঁর প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত কবিতাগুলিও প্রাতিষ্ঠানিক রোলারের নিচে চাপা পড়ে গেছে। অথচ প্রয়োজন তার কবিতাকে বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে পৌছে দেওয়া। কবিতার এক সৎ ও আন্তরিক এবং উদাসীন প্রেমিকের দীপ্ত মুহূর্তগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজন 'বিদ্রোহের' পুনঃ প্রকাশ।

যোগব্রত চক্রবর্তীর একটি কবিতা

অমৃতের পুত্র

সমস্ত শিশু কি জানে জন্মের গোপন ইতিহাস, পিতৃপরিচয়
জানা নেই।

সমস্ত শিশু কি জানে প্রসব যাতনা
ভূমিষ্ঠ সময় ?
জানা নেই।

কোন শিশু শুনেছে কি সংগম কাতর ধ্বনি জননীর
কিংবা তার তৃষিত উল্লাস ?
জানা নেই।

অমৃতের পুত্র সব এই সত্য পুনঃ প্রচারিত হোক।

আমাদের এই সুসভ্য পৃথিবীতে প্রতি মিনিটে ৩০টি শিশু না খেতে পেয়ে মরে এবং তখনই সর্বাধুনিক পারমাণবিক বোমা তৈরীর জন্য খরচা হয় প্রতি মিনিটে ১৬ লক্ষ ডলার

[১৯৮৩ সালের হিসাব]

শেষ

পূজোর আগে অভাবনীয় বৃষ্টিজাত বন্যায় ছাপার কাজ শেষ করতে পারিনি। অনিবার্যতা সত্ত্বেও দুঃখিত। কিন্তু ছাপার কাজ যেদিন শেষ হবার কথা, ঠিক সেই মুহূর্তে খবর এল বিশ্বের কোটি কোটি সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, বাঁচবার অধিকার কেড়ে নিতে পরমাণু অস্ত্র তৈরী ও তার গবেষণা দশ বছর বন্ধ রাখার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে এবং 'নক্ষত্র যুদ্ধে'র সম্ভাবনা জিইয়ে রেখে আইসল্যাণ্ড ত্যাগ করেছেন রোনাল্ড রেগান।

—প্রকাশক

সম্পাদকীয়

জবরদস্ত একখানা সম্পাদকীয় লিখে চমকে দেবো ভেবেছিলাম। কয়েক হাজার শব্দ আর কয়েকটা রাত কাটিয়ে খুব অপ্রাসঙ্গিক ও রতিক্লান্ত মনে হলো। অবশেষে বুক-পকেটের টুকরো কাগজগুলো পরপর সাজিয়ে দিলাম অচলিত কোণে—

*

শিশু-শ্রমিক প্রথা এ মহান ভারতবর্ষে সংবিধান কর্তৃক নিষিদ্ধ

তামিলনাড়ুর দেশলাই কারখানাগুলোতে
অনেক শিশু-শ্রমিকের বয়স ৪ বছর।
সারাদিন কাজ করে তারা।
উপার্জন করে ১ টাকার মত।

পাঠক, আপনি কেঁপে উঠলেন কেন? আমরা তো কথা দিয়েছি আপনাকে একবিংশ শতাব্দীতে নিয়ে যাব।

*

ভারতবর্ষ যখন পৃথিবীর শান্তির জন্য ককিয়ে উঠছে—
ভারতবর্ষের মানুষ যখন আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ অপশাসনের বিরুদ্ধে জনমত তৈরী করছে—

তখন,

ভারতবর্ষের বিহার নামক একটি প্রদেশে বর্ণহিন্দু, জমিদার ও জোতদাররা তাহাদের গুণ্ডাশ্রেণী ও তাহাদের পেটোয়া পুলিশের সাহায্যে দরিদ্র মানুষের সমস্ত গ্রাম জ্বালাইয়া দিতেছে, গণধর্ষণ ও সর্বপ্রকার অত্যাচার করিয়া তাহাদের গ্রাম হইতে বিতাড়িত করিতেছে। এবং গড়ে প্রতি বৎসর তাহাদের অত্যাচারে খুন হইতেছে ছয়শত (৬০০) নিম্নবর্ণের মানুষ।

আমার আপনার গায়ে একথা আঁচড় কাটে না। কারণ আমরা মধ্যবিত্ত, আমাদের প্রগতিশীল রাজনীতি রহিয়াছে, রহিয়াছে রবীন্দ্রসংগীত, কালার টিভি। ছোটলোক মরিলে আমরা উত্তেজিত হইব কেন?

*

এ এক অদ্ভুত তীর্থক্ষেত্র:

এখানে কম্যুনিষ্টরা টোপর মাথায় দিয়া পণ লইয়া জাত মিলাইয়া বিবাহ করে। গণসংগঠন করিবার জন্য দুর্গাপূজা কালীপূজা করিয়া থাকে। গৃহে ঝিকে মাসে ত্রিশ টাকা মাহিনা দিয়া আক্রান্ত বোধ করে এবং ডি.এ.-র সংস্থান কেন বাড়িল না জানিবার জন্য লাল শালুতে রোদ বাঁচাইয়া আন্দোলন করিতে যায়।

অনার্য সাহিত্য/৫

এই সংখ্যার লেখা :

গল্প — সুমন্ত সরকার, সুবিমল মিশ্র।

প্রবন্ধ — মলয় রায় চৌধুরী, অজিত রায়, এ্যালেন গীন্সবার্গ শ্রীধর মুখোপাধ্যায়।

গদ্য — শ্রীধর মুখোপাধ্যায়, অংশুদেব মণ্ডল।

কবিতা — তাপস চক্রবর্তী, তিমির দেব, ঈশিতা ভাদুরী, কাজল চক্রবর্তী, শঙ্করনাথ চক্রবর্তী, শুভব্রত চক্রবর্তী, সংযম পাল, অমলেন্দু বিশ্বাস, নারায়ণ বৈরাগ্য, পঙ্কজ মণ্ডল, রণজিৎ হালদার, অতনু সেনগুপ্ত, স্বপন রায়, মনীশ সিংহ রায়, অমিতেশ মাইতি, বৃন্দাবন দাস, মধুসূদন চাবরী, সুব্রত মণ্ডল, রূপ সাহা, কৃষ্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ পাণ্ডা, অলোক গোস্বামী।

এবং তীব্র বিষাদে উগ্‌রে দেওয়া

একটি রীতি-বিরুদ্ধ সম্পাদকীয়—প্রবন্ধ

যোগাযোগ :

অনার্য সাহিত্য

৮, সৃষ্টিধর দত্ত লেন,

কলকাতা-৭০০ ০০৬

সম্পাদনা : শ্রীধর মুখোপাধ্যায়

তিমির দেব কর্তৃক আভা প্রিন্টার্স, ২৮, শান্তিরাম রাস্তা, বালি, হাওড়া-৭১১২০১ থেকে প্রকাশিত ও মুদ্রিত।

Rs. 4·00